নভেম্বর ২০২০ ▪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস: পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড

করোনাকালে নারী

আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফসলের মাঠ

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস

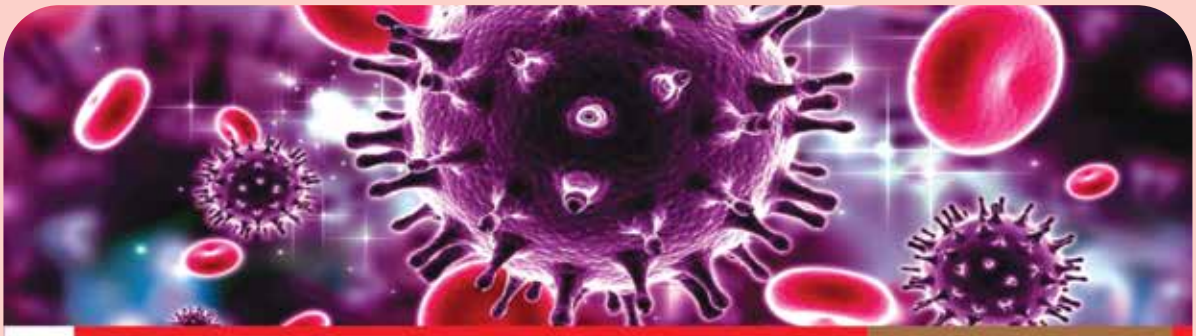

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নভেম্বর ২০২০ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জাতীয় চার নেতা

সম্পাদকীয়

তেসরা নভেম্বর জাতীয় জেল হত্যা দিবস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ১৯৭১ সালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা ও সুহৃদ। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে মহান এই বীরদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সেই সঙ্গে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। এ সংখ্যায় জেল হত্যা বিষয়ে রয়েছে একাধিক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

পঁচিশে নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। দেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। নারী ধর্ষণ একটি ঘৃণিত অপরাধ। দেশে ২০০০ সালে নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন। সম্প্রতি এই আইন সংশোধন করে সরকার যাবজ্জীবন শাস্তির পরিবর্তে ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান করেছে।

ঋতু বৈচিত্র্যে আবর্তিত বাংলার প্রকৃতি। এই হেমন্ত ঋতুতে মাঠে মাঠে পাকা ধানের শিষে কৃষকের স্বপ্ন দোল খায়। বাংলার এই ঋতুতে নবান্ন উৎসব হয়। নবান্ন উৎসব মানেই নতুন চাল বা অন্নের উৎসব। বাদশাহ আকবরের সময় থেকেই পহেলা অগ্রহায়ণ (মধ্য নভেম্বর) বাংলা নববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। হেমন্তকাল এসে পৌঁছুতেই শস্যের মাঠ হলুদ ধানে ছেয়ে থাকে। এ সময় ধান কেটে সিদ্ধ করে শুকিয়ে নতুন ধানের চালে তৈরি হয় পিঠাপুলি, পায়েশ। বাংলার প্রতি ঘরে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই এ উৎসবে মেতে ওঠে। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ছড়া-কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে নভেম্বর সংখ্যা।

আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস: পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

করোনাকালে নারী ৭
ড. মোহাম্মদ হাননান

করোনাকালে সরকারের উদ্যোগ ৯
মো. কামাল হোসেন

আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফসলের মাঠ ১২
ফারিহা রেজা

ছড়া-কবিতায় বঙ্গবন্ধু ১৩
মুহাম্মদ ইসমাঈল

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস ১৬
সানিয়াত রহমান

আন্তর্জাতিক সর্প দংশন সচেতনতা দিবস ১৭
রাবেয়া নূর

ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৮
খান চমন-ই-এলাহি

মানুষের কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন ২০
মিয়াজান কবীর

করোনাকালে ডায়াবেটিসে করণীয় ২২
মো. খালেদ হাসান

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা ২৩
কে সি বি তপু

ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব ২৫
সুস্মিতা চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু এবং সমবায় ২৬
নাজমুন নাহার

কিশোরগঞ্জে হাওরের বুকে দৃষ্টিনন্দন পিচঢালা পথ ২৮
রেজুয়ান খান

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণিকুল ২৯
পুলক আহমেদ

ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় এগিয়েছে বাংলাদেশ ৩১
সৈকত নন্দী সৌখিন

শব্দের জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ ৩২
আমব্রিন আজওয়া

হেমন্ত: কোমল শিশিরের দিন ৩৪
তনয় সালেহা

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক: শহিদ নূর হোসেন ৩৫
মানীষ কুমার

টিকা কার্যক্রমে সরকারের সাফল্য ৩৬
মাসুদ উদ্দিন জুয়েল

সচেতনতাই নিউমোনিয়া থেকে শিশুমৃত্যু রোধ করবে ৩৭
রিপন তাহেরী

জনপ্রিয় সিনেমা নির্মাতা কাজী জহির ৩৮
আপন চৌধুরী

হাইলাইটস

গল্প

তখন লকডাউন ৩৯
কাবেরী বসু

কবিতাগুচ্ছ ৪১-৪৫
শাফিকুর রাহী, জাকির আবু জাফর
আবুল হোসেন আজাদ, আহসানুল হক
ম. মীজানুর রহমান, লিলি হক
দেলওয়ার বিন রশিদ, কামাল বারি
প্রত্যয় জসীম, অদ্বৈত মারুত
ইমরুল ইউসুফ, রুস্তম আলী
এস এম তিতুমীর, রকিবুল ইসলাম
শাহ্ সোহাগ ফকির, নুরুল ইসলাম বাবুল
মুসলিমা খাতুন (শান্তি), মো. মাইদুল ইসলাম জনী
নীলিমা নিশাত রিমি

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫১
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
শিক্ষা ৫৩
বিনিয়োগ ৫৪
নারী ৫৪
কৃষি ৫৬
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
বিদ্যুৎ ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
কর্মসংস্থান ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
যোগাযোগ ৫৯
চলচ্চিত্র ৬০
সংস্কৃতি ৬১
মাদক প্রতিরোধ ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩
না ফেরার দেশে একুশে পদকপ্রাপ্ত
চিত্রশিল্পী মনসুর উল করিম ৬৪
আফরোজা রুমা

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস: পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড

পঁচাত্তরের ২রা নভেম্বর দিবাগত রাত ৩রা নভেম্বরে ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় জেলখানায় রাখা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণের সহচর, একাত্তরের বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের কর্মবীর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আজীবন সঙ্গী ছিলেন জাতীয় চার নেতা। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, ইন্দিরা গান্ধী তথা ভারত, রাশিয়ার সহযোগিতা আদায় ও রাষ্ট্রের সমর্থন তাঁদের নিরলস পরিশ্রমেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা চিরকাল বাঙালি জনমানসে অমর হয়ে থাকবেন। এ বিষয়ে 'তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস: পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

করোনাকালে নারী

জাতিসংঘের দুই সংস্থা শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করে চলেছে। করোনার ঝুঁকির চেয়ে সন্তানকে বুকের দুধ দেওয়ার মধ্যে লাভ অনেক বেশি– এমনটাই মন্তব্য করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সরকারি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান করানোর হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা হয়েছে। জনাকীর্ণ স্থান এবং কর্মস্থলে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৬৪ শতাংশ শিশু ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করে। ২০২১ সালের মধ্যে এ হার ৭৫ শতাংশে উন্নীত করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি মায়েদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে 'করোনাকালে নারী' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৭

আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফসলের মাঠ

এবারের বন্যায় কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুরু হয়েছে কৃষকদের সংগ্রাম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বন্যার পরে সরকারি সহযোগিতা বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। সরকারিভাবে ধানের চারা দেওয়া হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এই মন্ত্রণালয় কৃষিজীবীদের কল্যাণে যেসব কর্মসূচি নিয়েছে তাতে বন্যার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে এবং আমন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন কৃষকরা। বন্যা-পরবর্তী লড়াইয়ে তাদের পাশে থাকছে সরকার। এ বিষয়ে 'আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফসলের মাঠ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১২

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস

২৪শে আগস্ট পালিত হয় জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। ২৫শে নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। সম্প্রতি ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন– যা এখন সংশোধিত আইনে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ বিষয়ে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৬

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবসঃ

পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড

খালেক বিন জয়েনউদদীন

তাঁরা ছিলেন না কোনো মামলা-মোকদ্দমার আসামি কিংবা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি। তবুও প্রচণ্ড ভয় ছিল– লোকগুলো বাইরে থাকলে একাত্তরের মতো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। ঢোকাও জেলখানায়। সময়মতো তাঁদের হিল্লে করা যাবে। তাঁদের হিল্লে হলো জেলখানার একটি কক্ষে এনে স্টেনগানের গুলি দিয়ে, একবার নয়, দুবার হত্যা করা হলো। কেউ জানল না! জানল শুধু বঙ্গভবন দখলকারী সামান্য কজন বরখাস্তকৃত ও চাকরিরত সেনাসদস্য এবং তাদের বানানো নাটেরগুরু মুখে দাড়ি ও মাথায় পাকিস্তানি টুপি পরা সেই লোকটা। তাদের সঙ্গে আরো ছিল দেশি-বিদেশি চর, দূত ও পর্দার আড়ালে থাকা কুশীলবেরা। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম সেই পঁচাত্তরের ২রা নভেম্বর দিবাগত রাত ৩রা নভেম্বরের কথা। ঐ রাতেই ঢাকা শহরের নাজিমউদ্দীন রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় জেলখানায় রাখা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণের সহচর, একাত্তরের বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের কর্মবীর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকে আমরা বলি জেল হত্যাকাণ্ড এবং দিনটি জেল হত্যা দিবস। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছিল। প্রতিবছর এই দিনটি আমরা জাতীয় ঐ চার নেতার স্মরণে উদ্‌যাপন করি জাতীয় শোক দিবসের মতো। জাতীয় শোক দিবস পনেরোই আগস্ট ও তেসরা নভেম্বর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা হয় তেসরা নভেম্বর অন্ধকার রাতে। উভয় ঘটনার ষড়যন্ত্রকারী, নির্দেশদাতা ও বাস্তবায়নকারী ছিল খন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান, ফারুক, রশিদরা।

এদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার-পরিজন ও নিকট স্বজনদের হত্যা করা হয় এবং বাংলাদেশের সকল অর্জন বিনাশের চেষ্টা করা হয়। একাত্তরে খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশকে হাফ পাকিস্তানে পরিণত করার অপচেষ্টা চালায়। বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতা একাত্তরের পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে বুঁড়ো আঙুল দেখিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান ভেঙে ছিলেন। ভেতরের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি ও বিদেশি শক্তি ছিল একাত্তর থেকে তৎপর ও তক্কে তক্কে। সময় ও সুযোগ বুঝেই মোশতাক-জিয়ার নির্দেশ পেয়ে ফারুক-রশিদ-ডালিমদের হত্যার অপারেশন, যা ১৫ই আগস্ট।

পনেরোই আগস্টের ঘটনা আমরা সবাই জানি। বিশ্বও দেখেছে আগস্টের হত্যাকারীদের কীভাবে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। তবুও আমাদের তেসরা নভেম্বরের ঘটনা জানতে হলে আগস্টের প্রেক্ষাপট এবং ঘটনার পরবর্তী মোশতাক, জিয়া, ফারুক, রশিদ, মেজরদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৫ই আগস্টে মোশতাক নিজেই রাষ্ট্রপতি বনে যায়। মেজরদের নিয়ে বঙ্গভবন দখল করে। তার চারপাশ ঘিরে থাকে মেজর গ্রুপের ফারুক, রশিদ, ডালিম, হুদা, পাশা, শাহরিয়ার, মোসলেম উদ্দিন, তাহের ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষি, শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান, ওসমানী ও জিয়া। এসময় মোশতাক স্টেনগান দেখিয়ে একটি সরকার গঠন করে। জিয়াকে প্রধান সেনাপতি বানায়। ওসমানীকে প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োগ করে। তোরাবকে পররাষ্ট্র সচিব, কেরামত আলীকে সংস্থাপন সচিব এবং শফিউল আজমকে কেবিনেট সচিব পদে বসানো হয়। এরপর মোশতাক শুরু করে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের গ্রেপ্তার, তৃণমূল পর্যায়ে নিপীড়ন-অত্যাচার ও হত্যা। আর শুরু করে স্বাধীনতা-বিরোধী জামাতপ্রধান মওলানা আবদুর রহীমসহ অন্যদের মুক্তি দেওয়ার কাজ। এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্য মতীন চৌধুরী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কবি মযহারুল ইসলামকেও বন্দি করে। সকল সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানরা এবং বিদেশি একটি রাষ্ট্র তার সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন জানালেও মোশতাক প্রথম থেকেই নিজেকে নিরাপদ বোধ করত না। যদিও সর্বক্ষণ তার চারপাশে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ফারুক-রশিদরা।

মোশতাক এক পর্যায়ে জিল্লুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে এবং জাতীয় চার নেতার সমর্থন আদায়ের জন্য দূতিয়ালি শুরু করে। ক্যাপটেন মনসুর আলীকে বঙ্গভবনে নিয়ে আসে। কিন্তু বিফল মনোরথ। তাঁরা কেউই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। এক অর্থে দূত

ঠাকুর-চাষি ও মেজরদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করেন মোশতাকের প্রস্তাব। ফল দাঁড়ালো ১ দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রাখা হলো। এক পর্যায়ে নাজিমউদ্দীন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে।

মোশতাকের দিন যায় সংকটে ও আতঙ্কে। লোকটা বুঝতে পারে তার দিন শেষ হয়ে আসছে। সেনাপ্রধান জিয়া ও তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা ওসমানী সর্বক্ষণ বঙ্গভবনে মনমরা হয়ে আসেন। অগত্যা লোকটা কিলিং উপদেষ্টা ফারুক-রশিদ-ঠাকুর-চাষিদের নিয়ে বারবার বৈঠক করে। বৈঠকে মোশতাককে ঠাকুর-চাষিরা বলে– ঐ চার ব্যক্তিই শুধু আমাদের সমর্থন করেনি। তাঁরা রাষ্ট্রপতির পথের কাঁটা। মোশতাকও বলে– লক্ষ্য হাসিলের জন্য পথের কাঁটা উপড়ে ফেলতে হবে। বৈঠকে আগস্টের এক খুনি বলে– সেজন্য আমরা প্রস্তুত। এরপর ২রা নভেম্বর দিবাগত রাতে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে ঠান্ডা মাথায় দুবার মোসলেমের নেতৃত্বে হত্যা করা হয়। মূল ঘটনাটি যাদের সামনে ঘটেছে, তাদের মধ্যে একজন আইজি প্রিজন এন. জামান। তিনি এই ঘটনার একটি পূর্ণ বিবরণ লিখে স্বরাষ্ট্র সচিবের বরাবর পাঠান। বিবৃতিমূলক বিবরণটিতে তিনি উল্লেখ করেন:

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

মোহাম্মদ মনসুর আলী

> ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ভোর ৩টায় আমি বঙ্গভবন থেকে মেজর রশিদের একটি ফোন পাই। তিনি আমার কাছে জানতে চান, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কোনো সমস্যা আছে নাকি। আমি জানালাম, ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থা আমার জানা নেই। এরপর তিনি আমাকে জানালেন, কয়েকজন বন্দিকে জোর করে নিয়ে যেতে কয়েকজন সেনা সদস্য জেলগেটে যেতে পারে, আমি যেন জেল গার্ডদের সতর্ক করে দেই। সে অনুযায়ী আমি সেন্ট্রাল জেলে ফোন করি এবং জেলগেটে দায়িত্বে থাকা ওয়ার্ডারকে ম্যাসেজটি জেলারকে পৌঁছে দিতে বলি, যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।
>
> ৩/৪ মিনিট পর বঙ্গভবন থেকে আরেকজন আর্মি অফিসারের ফোন পাই। তিনি জানতে চান আমি ইতিমধ্যেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গার্ডদের সতর্ক করে দিয়েছি কিনা। আমি ইতিবাচক জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য জেলগেটে চলে যেতে বলেন। আমি তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ডিআইজি প্রিজনকে ফোন করি। খবরটি জানিয়ে আমি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে জেলগেটে চলে যেতে বলি। দেরি না করে আমিও জেলগেটে চলে যাই এবং ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া জেলারকে আবার গার্ডদের সতর্ক করে দিতে বলি। এরই মধ্যে ডিআইজিও জেলগেটে পৌঁছেন। বঙ্গভবন থেকে পাওয়া খবরটি আমি আবার তাকে জানাই।

এর পরপরই মেজর রশিদের আরেকটি ফোন পাই। তিনি আমাকে জানান, কিছুক্ষণের মধ্যেই জনৈক ক্যাপ্টেন মোসলেম জেলগেটে যেতে পারেন। তিনি আমাকে কিছু বলবেন। তাকে যেন জেল অফিসে নেওয়া হয় এবং ১। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ২। জনাব মনসুর আলী ৩। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৪। জনাব কামারুজ্জামান– এ ৪ জন বন্দিকে যেন তাকে দেখানো হয়।

এ খবর শুনে আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং টেলিফোনে প্রেসিডেন্টকে খবর দেওয়া হয়। আমি কিছু বলার আগেই প্রেসিডেন্ট জানতে চান, আমি পরিষ্কারভাবে মেজর রশিদের নির্দেশ বুঝতে পেরেছি কিনা। আমি ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি আমাকে তা পালন করার আদেশ দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৪ জন সেনা সদস্যসহ কালো পোশাক পরা ক্যাপ্টেন মোসলেম জেলগেটে পৌঁছান।

ডিআইজি প্রিজনের অফিস কক্ষে ঢুকে তিনি আমাদের বলেন, পূর্বোল্লিখিত বন্দিদের যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে তাকে নিয়ে যেতে। আমি তাকে বলি, বঙ্গভবনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আমাকে কিছু বলবেন। উত্তরে তিনি জানান, তিনি তাদের গুলি করবেন। এ ধরনের প্রস্তাবে আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে যাই। আমি নিজে এবং ডিআইজি প্রিজন ফোনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। সে সময় জেলারের ফোনে বঙ্গভবন থেকে মেজর রশিদের আরেকটি কল আসে। আমি ফোনটি ধরলে মেজর রশিদ জানতে চান, ক্যাপ্টেন মোসলেম সেখানে পৌঁছেছেন কিনা। আমি ইতিবাচক জবাব দিই এবং তাকে বলি, কী ঘটছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন মেজর রশিদ আমাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। আমি প্রেসিডেন্টকে ক্যাপ্টেনের বন্দিদের গুলি করার ইচ্ছার কথা জানাই। প্রেসিডেন্ট জবাব দেন, ওরা যা বলছে তাই হবে। তখন আমরা আরো উত্তেজিত হয়ে যাই। ক্যাপ্টেন মোসলেম বন্দুকের মুখে আমাকে, ডিআইজি প্রিজন, জেলার ও সে সময় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যেখানে উপরিল্লিখিত বন্দিদের রাখা হয়েছে। ক্যাপ্টেন ও তার বাহিনীকে তখন উন্মাদের মতো লাগছিল এবং আমাদের কারো তাদের নির্দেশ অমান্য করার উপায় ছিল না, তার নির্দেশ অনুযায়ী পূর্বোল্লিখিত ৪ জনকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং একটি রুমে আনা হয়, সেখানে জেলার তাদের শনাক্ত করেন। ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তার বাহিনী তখন বন্দিদের গুলি করে হত্যা করে। কিছুক্ষণ পর নায়েক এ. আলীর নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল সবাই মারা গেছে কিনা তা নিশ্চিত হতে জেলে আসে। তারা সরাসরি সেই ওয়ার্ডে চলে যায় এবং পুনরায় তাদের মৃতদেহ বেয়নেট চার্জ করে।

স্বাক্ষর
এন. জামান
মহা কারাপরিদর্শক
৫-১১-১৯৭৫

জেল হত্যাকাণ্ড সুকৌশলে ও গোপনে সংগঠিত করা হয়েছিল। ঐ রাতেই একাত্তরের বীর সৈনিক খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ক্ষমতার পালাবদল শুরু হয়েছিল। জিয়াউর রহমানকে বন্দি ও পদ কেড়ে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেওয়া হয়েছিল। ৩রা নভেম্বর খালেদ-সাফায়াত বঙ্গভবনে এসে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারেন। ২রা নভেম্বর দিবাগত রাত থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতার লড়াই চলছিল। খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা গ্রহণ করলেই জেলখানার ঘটনা না জেনেই দেশবাসী আওয়ামী লীগের ডাকে হরতাল পালন করে। অন্যদিকে ৪ঠা নভেম্বর হত্যা ও বঙ্গবন্ধুর স্মরণে একটি প্রতিবাদ মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়ে মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। মোনাজাত করেন যশোরের মওলানা জেহাদী। মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন– মহিউদ্দীন আহমদ, সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, খালেদ মোশাররফের ভাই রাশেদ মোশাররফ, ফজলুল হক ভূঁইয়া, মোনায়েম সরকার, আবু সাইয়িদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কাজী আকরাম হোসেন, মাহবুব জামান, এসএম ইউসুফ, নিমচন্দ্র ভৌমিক, রবিউল আলম চৌধুরী, শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শাহ আবু জাফর, ওবায়দুল কাদের, ইসমত কাদির গামা, মমতাজ হোসেন, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, মোশাররফ, ইলিয়াস মল্লিক, সালাহউদ্দিন, চন্দন চৌধুরী, মোস্তফা জামাল মহিউদ্দীন প্রমুখ।

খালেদ মোশাররফ জেল হত্যাকাণ্ডের পরপরই মোশতাককে অপসারিত করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মোশতাকের কিলিং গ্রুপ ফারুক-রশিদরা সিঙ্গাপুর পালিয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি সায়েম নিযুক্তি পান। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে খালেদ মোশাররফ বিচারপতিদের নিয়ে জেল হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জিয়া তা বাতিল করে। মোশতাকের স্বপ্নই জিয়া অবৈধভাবে ক্ষমতায় থেকে কার্যকর করে। এই লোকটি ছিল পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের প্রশিক্ষিত চর।

জেল হত্যাকাণ্ড আমাদের শিক্ষা দেয় মানুষ হত্যার পরিণাম শুভ হয় না। ধর্মেও তাই। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীরা কালের আবর্তে ডুবে গেছে। ডুবে গেছে মোশতাক, জিয়া ও পর্দার আড়ালে থাকা ইন্ধনকারীরা। বাংলার আকাশে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আর তার মধ্যমণি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর আজীবন সঙ্গী ছিলেন জাতীয় চার নেতা। একাত্তরের পূর্বে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করায় তাঁদের অবদান, ত্যাগ-তিতিক্ষা অপরিসীম। আর একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, ইন্দিরা গান্ধী তথা ভারত, রাশিয়ার সহযোগিতা আদায় ও রাষ্ট্রের সমর্থন কেবলমাত্র তাঁদের নিরলস পরিশ্রমেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন মুজিব আদর্শে বিশ্বাসী। মোশতাক শত প্রলোভন দেখিয়েও তাঁদের বিচ্যুত করতে পারেনি। শেষমেষ জীবনদানে প্রমাণ করেছেন মুজিবের দুই হাত ও দুই পা-ই ছিলেন এই চার সৈনিক। যাঁদের ওপর ভর করেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর এই জাতীয় চার নেতার সকল কর্মকাণ্ডে, ভাষণ ও বিবৃতিতে মুজিব ছিলেন ভাস্বর।

জেল হত্যাকাণ্ডের বিচার আজো সম্পন্ন হয়নি। তবে জেলখানায় তাঁদের অবস্থানের কক্ষগুলো বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা কারাস্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরিত করেন এবং ঐ বছর মে মাসে উদ্‌বোধন করেন। অনেকেই জানেন না, একমাত্র কামারুজ্জামান ছাড়া সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও তাজউদ্দীন আহমদকে ঢাকার বনানীতে সমাধিস্থ করা হয় আর রাজশাহীতে কামারুজ্জামানকে।

যেহেতু খালেদ মোশাররফের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে তাঁর অজ্ঞাতে ১৫ই আগস্টের মতো খুনিচক্র জেল হত্যা ঘটনাটি ঘটায়, সেহেতু বলতে হয় খালেদ মোশাররফ বেঁচে থাকলে সকল হত্যার বিচার ঐ সময়েই দেখতে পেতাম। কিন্তু জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর জলিল-তাহেরের উপস্থিতিতে শেরেবাংলা নগরে খালেদ মোশাররফ ও মুক্তিযুদ্ধের চার সেনানী কর্নেল হুদা ও হায়দারকে হত্যা করা হয়। মূলত ১৫ই আগস্টের পর শুরু হয় হত্যার রাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াই। এ লড়াইয়ে জনগণের গণতন্ত্র পরাজিত হয়। ক্ষমতা বন্দি হয় সেনানিবাসে। আর সেই গণতন্ত্র উদ্ধার করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা ও গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা।

জেল হত্যা দিবসে আমরা গভীর শোক-বেদনায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং স্মরণ করছি পনেরোই আগস্টে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ ও তেসরা নভেম্বরের প্রাণ উৎসর্গকারী জাতীয় চার নেতাকে। তাঁরা চিরকাল বাঙালি জনমানসে অমর হয়ে থাকবেন। তাঁরা বাঙালির ইতিহাসের চিরজাগরুক সন্তান।

লেখক: সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

করোনাকালে নারী

ড. মোহাম্মদ হাননান

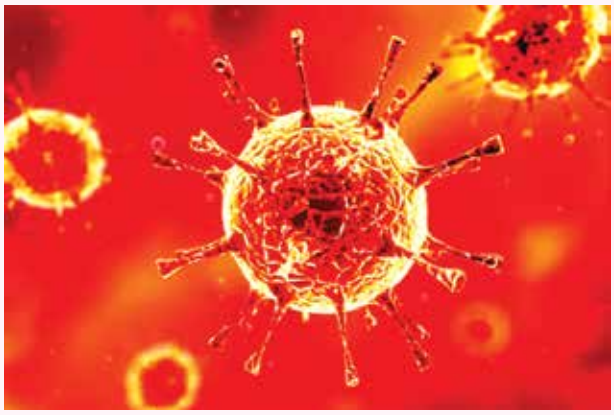

সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি সাময়িকীতে এক লেখায় একজন নারী লিখেছেন, 'ছেলে যখন বউয়ের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলে, মা মনে করেন, বউ ছেলেকে বশ করেছে। মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারে মায়েদের আপত্তি এখন সবচেয়ে বেশি।' [*দেশ*, কলকাতা, ১৭ই মার্চ ২০২০]। এ মন্তব্যে দুটো দিক খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হয়েছে, এক. ছেলেরা এখন তার বউয়ের স্বাধীনতার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। এটা দীর্ঘ দিনের নারী আন্দোলনের সফলতা। দুই. এখন নারীরাই নারীকে আটকে রাখছে। মা চান তার কন্যা আরো একটু সংহত হোক।

দ্বন্দ্বটা বেশ পুরনো। অনেক মেয়ের মধ্যেই স্বাধীনতা ও আধুনিকতার নামে অনেক সংস্কার কাজ করে। এর মধ্যে একটি হলো, সন্তানকে তার মায়ের দুধ পান করানো বিষয়ে, যার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯২ সাল থেকে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। জাতিসংঘের দুই সংস্থা শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) প্রতিবছর মেয়েদের মধ্যে সচেতনতার জন্য মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করে চলেছে। অনেক মা-ই মায়ের দুধের উপকারিতা ও গুরুত্ব বোঝেন না অথবা সংস্কারবশে এটাকে এড়িয়ে চলেন। এতে করে সন্তান বঞ্চিত হয়। এ বঞ্চনা সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে, যা তার অধিকারকেও খর্ব করে। অথচ মায়ের দুধ পানে শিশু শুধু সুস্থ-সবলই হয়ে ওঠে না, প্রসূতি মা নিজেও উপকৃত হন ক্যানসার-হৃদরোগের ঝুঁকি ইত্যাদি থেকে।

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসে নারীরা অধিক দিশেহারা। এ ঝুঁকির মধ্যেও করোনায় আক্রান্ত নারীকে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের বুকের দুধ থেকে শিশুদের বঞ্চিত না করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে যেতে হবে। কিছুতেই মা ও সন্তানকে আলাদা করা যাবে না। করোনার ঝুঁকির চেয়ে সন্তানকে বুকের দুধ দেওয়ার মধ্যে লাভ অনেক বেশি– এমনটাই মন্তব্য করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তারা আরো বলেছে, এ পরিস্থিতিতেও শিশুর অনেক রোগ ও জটিলতা মায়ের দেওয়া বুকের দুধ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। [জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের অনলাইন ব্রিফিং, ১২ই জুন ২০২০] আমরা জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

আমাদের ধর্মগ্রন্থেও মায়ের দুধের উপর অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে' [আয়াত নম্বর: ২৩৩]। এ আয়াতকে সামনে রেখে *পবিত্র কোরান-এর* তাফসিরকাররা বলেছেন, শিশুদের স্তন্যদান মায়ের ওপর ওয়াজিব। কারণ এটা শিশুর অধিকার [মুফতি সাফি: *তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন*, পৃষ্ঠা: ১৩০]। অন্যত্র আরেকটি আয়াত, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস [সূরা আল আহকাফ, আয়াত: ১৫]। আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে, 'সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এরপরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহতায়ালা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করেন'। আয়াতে বলা হয়েছে, 'সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়' [*তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন*, পৃষ্ঠা: ১২৪৯]।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বা ধর্মীয় গ্রন্থ– যে রেফারেন্সেই বিষয়টা আসুক, মাতৃদুগ্ধের বিকল্প এ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। বিষয়টা এমনই যে, মাতা যদি করোনা আক্রান্ত হন, তাহলেও তিনি শিশুকে দুধ পান করাবেন। পূর্বে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো আমাদের এ পাঠই দিচ্ছে।

এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের দুধ পান বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। শিশুর জন্মের পর তার পুষ্টির চাহিদা মেটাতে মায়ের দুধই প্রধান বিকল্প। কারণ দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার মানুষের শরীরে আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে এবং হাড় ক্ষয়রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় দুধ পানে বরাবরই অনগ্রসর এক জাতি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, 'দেশে দৈনিক মাথাপিছু দুধ গ্রহণ হয় ১৬৫ মিলিমিটার'। দুধ নিয়মিত খাওয়ার ব্যাপারেও দেশের মানুষের মাঝে বেশ দুর্বলতা রয়েছে। তরিতরকারিতে শুকনো মরিচ ব্যবহারে মানুষ যত টাকা ব্যয় করে, দুধ কেনার ক্ষেত্রে তা অনেক পেছনে। অথচ দেশের মানুষ তার অভ্যাস বদলালে, এ করোনাকালে সকলে বিশেষ করে নারীরা অনেক উপকৃত হতো। করোনায় নারীর জন্য, তার প্রসূত সন্তানের জন্য আমিষ জাতীয় খাবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দুধ উন্নতমানের আমিষের উৎস। এটা তরল হওয়ার কারণে করোনাকালে মা ও শিশুর জন্য তা যারপরনাই উপকারী।

২০১৯ সালের ২২শে অক্টোবর নিরাপদ পরিবেশে, স্বাচ্ছন্দ্যে মায়ের বুকের দুধ পান করাতে বাংলাদেশে নয় মাসের শিশু উমাইর বিন সাদিকের পক্ষে তার মা ইশরাত হাসান হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সব কর্মক্ষেত্র, এয়ারপোর্ট, বাস স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন, শপিং মলে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' ও 'বেবি কেয়ার কর্নার' স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে

চেয়ে রুল জারি করেছিল হাইকোর্ট। এছাড়াও পাবলিক প্লেস ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপনে নীতিমালা তৈরি করতে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয় আদালত। ইশরাত হাসান বলেন, অনেক কর্মস্থলে বা বাস, ট্রেন স্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার না থাকায় মায়েদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। নিরাপদ পরিবেশের অভাবে ও যৌন হয়রানির ভয়ে মায়েরা শিশুদের বুকের দুধ পান করাতে পারেন না। অথচ একজন শিশুর মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মায়ের বুকের দুধ।

যদিও সরকারি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান করানোর হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও এখনো আমাদের অনেক কিছু করার রয়ে গেছে। যেহেতু মাতৃদুগ্ধপানের হিতকারী ফল অপরিসীম, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মায়ের বুকের দুধের সব ধরনের বিকল্পের বিজ্ঞাপন ও বিপণন সীমিত করতে এবং বিপণনের আন্তর্জাতিক বিধির মনিটরিং ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা হয়েছে। জনাকীর্ণ স্থান এবং কর্মস্থলে মায়েরা যাতে শিশুকে বুকের দুধ দিতে পারেন, সে লক্ষ্যে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার করা হয়েছে। সব অফিস-আদালতে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের সব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র মা ও শিশুবান্ধব করার ব্যাপারে সরকারের নির্দেশনা রয়েছে। কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগীদের প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আড়াই লাখের বেশি মা এ সুবিধা পাচ্ছেন। এটা একটা আশার খবর যে, ৬৪ শতাংশ শিশু ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করে। ২০২১ সালের মধ্যে এ হার ৭৫ শতাংশে উন্নীত করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি মায়েদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার এবারে করোনাকালে তাদের বৃহৎ বাজেটে করোনা মোকাবিলায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। নিঃসন্দেহে মাতৃস্বাস্থ্য এ বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হবে। করোনাকালে নতুন মা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। রাষ্ট্রীয় বাজেটের মতো পারিবারিক বাজেটেও প্রসূতি মা ও সন্তানকে একইরকম গুরুত্ব দিতে হবে। তবে এটা আশার কথা, দিন দিন পুরুষদের মধ্যে নারী বিষয়ে আগের তুলনায় সচেতনতা বেড়েছে এবং বেড়ে চলছে। এক্ষেত্রেও পুরুষরা প্রসূতি মা ও তার শিশু সন্তানকে সর্বোচ্চ স্থানে অগ্রাধিকার দেবেন।

মনে রাখতে হবে, শিশুরা করোনা ভাইরাসে যদিও কম সংক্রমণের মাত্রায় রয়েছে, কিন্তু যেসব শিশু ও মা অপুষ্টিতে ভুগছেন, তারা অবশ্যই উচ্চ ঝুঁকির মাত্রায় আছেন। সেজন্য সাধারণ সময়ে যেমন, করোনাকালেও তেমনি আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে মাতৃদুগ্ধের চেতনার বিস্তার ঘটাতে হবে। তবেই আমরা পুষ্টিসমৃদ্ধ এক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লাভ করতে পারব।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ের ব্রেইল সংস্করণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই অক্টোবর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সচিবালয় প্রান্তে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইয়ের ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন। ৭ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাগুলো লিখে রাখেন, সেজন্য তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সব সময় উৎসাহ দিতেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বইটির ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীর যে ডায়েরি, সেটা ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে আমাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও পড়তে পারে এবং তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের জুনে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমিয়া ও রুশ ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে।

প্রতিবেদন : অনিতা দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (ইউএনজিএ)-এর ৭৫তম অধিবেশনের 'High-Level on Financing for Development in the Era of Covid-19 and Beyond'-এ ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন–পিআইডি

করোনাকালে সরকারের উদ্যোগ

মো. কামাল হোসেন

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর সংক্রমণে গোটা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। এই ভাইরাসের ভয়াল থাবায় দেশে দেশে এখন স্বজনহারাদের আহাজারি। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশেই মহামারি আকারে ছড়িয়ে গেছে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল এখনো চলছে। ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত ও শক্ত অর্থনীতির দেশও আজ নাগরিকদের জীবন ও অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে দিশেহারা হয়ে কোভিড-১৯ মোকাবিলার পথ খুঁজছে। করোনা মহামারির মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে 'জীবন ও জীবিকা' দুই ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। একইসঙ্গে দরিদ্র মানুষের ত্রাণ সহযোগিতায় নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য, উৎপাদন যাতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, এজন্য সরকার বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বাড়ানোসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

করোনার কারণে জনসমাগম এড়াতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষের সরাসরি অনুষ্ঠান বাতিল করে ভার্চুয়ালি করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। বন্ধ করে দেওয়া হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের জন্য টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এবং অনলাইন পাঠদান চালু করাসহ সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখে এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনায় নিযুক্ত থাকে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দফায় দফায় বাড়িয়ে ৬৬ দিনের সাধারণ ছুটির ঘোষণা করে সরকার। এরপর এলাকাভিত্তিক লকডাউন করার মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। জনগণকে বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ এবং বিদেশ ফেরতদের ১৪ দিন বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশনা দেয় সরকার।

করোনা ভাইরাস মহামারির এই দুঃসময়ে সরকার জনগণের পাশে রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, 'আমাদের সাধ্য মতো আমরা মানুষের পাশে রয়েছি। আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আর এই করোনা ভাইরাসের সময়ে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে বলে আমি মনে করি। ইনশাল্লাহ, এই দুঃসময় আমরা পার করতে পারব'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনা

দেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কোভিড-১৯-এর উপসর্গ গোপন না রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসাধারণকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াসহ ৩১ দফা নির্দেশনা জারি করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে লুকোচুরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। করোনা চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সকল চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। যারা হোম কোয়ারেন্টিনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে। নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। নদীবেষ্টিত জেলাসমূহে নৌ-অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে হবে। সারা দেশের সকল সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নির্দেশনায় বলা হয়, জাতীয় এ দুর্যোগে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্রবাহিনী ও বিভাগসহ সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন, এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ত্রাণ কাজে কোনো ধরনের

দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে। সোশ্যাল সেফটি নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোনো জমি যেন পতিত না থাকে। সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে, যাতে বাজার চালু থাকে। সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।

আর্থিক ক্ষতি কাটাতে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল করোনা ভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি কাটাতে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন। এরমধ্যে শিল্প ঋণের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ২০ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষ ও কৃষকের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, প্রি-শিপমেন্ট ঋণ পাঁচ হাজার কোটি টাকা, গরিব মানুষের নগদ সহায়তায় ৭৬১ কোটি টাকা, অতিরিক্ত ৫০ লাখ পরিবারকে দশ টাকা কেজিতে চাল দেওয়ার জন্য ৮৭৫ কোটি টাকা। এছাড়াও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আগেও বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে সরকারের তরফ থেকে প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এবারের মতো এত বড়ো আকারের প্রণোদনা প্যাকেজ আগে আর দেওয়া হয়নি।

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্থবিরতা মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সহায়তার প্যাকেজ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কিছু কিছু ব্যক্তি পর্যায়ের প্যাকেজ সহায়তা বিতরণ কর্মসূচি শেষ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কিছু এখনো চলমান। তবে ব্যাবসায়িক সহায়তা প্যাকেজ পুরোটাই বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এ প্যাকেজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় গতিও এসেছে। ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খাতের সুবিধাভোগীরা এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলা সংক্রান্ত 'কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' শীর্ষক একটি বড়ো প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) আওতায় এবার এই প্রকল্পের জন্য 'বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা' খাত থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২০৬ কোটি ৭৪ লাখ টাকা।

করোনাকালে রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য স্বল্প সুদে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়ার ফলে মন্দার সময়ে শিল্পকারখানার মালিকরা অতিরিক্ত চাপ ছাড়াই তাদের কর্মী-শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারছেন। এছাড়া মাঝারি-ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে সেটা দিয়ে আর্থিক ক্ষতি সামাল দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। তারা মন্দা কাটিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে পারবেন। এভাবে কৃষক, রপ্তানিকারকরা একইরকম সুবিধা পাচ্ছেন।

করোনাকালে রোজার ঈদে দেশের প্রতিটি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনকে 'ঈদ উপহার' হিসেবে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে। করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া দেশের নিম্ন আয়ের ৫০ লাখ পরিবারের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। পরিবার প্রতি দেওয়া হয়েছে আড়াই হাজার টাকা। এ খাতে সরকারের মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। সারা দেশের নন-এমপিও কারিগরি, মাদ্রাসা ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫১ হাজার ২৬৬ জন শিক্ষককে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা এবং ১০ হাজার ২০৪ জন কর্মচারীকে জনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে সর্বমোট ২৮ কোটি ১৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

করোনাকালীন সংকটের জন্য প্রধানমন্ত্রী ১৩ হাজার ৯২৯টি কওমি মাদ্রাসার এতিম দুস্থদের জন্য ১৬ কোটি ৯৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন নন-এমপিও ৮০ হাজার ৭৪৭ জন শিক্ষক এবং ২৫ হাজার ৩৮ জন কর্মচারীর অনুকূলে ৪৬ কোটি ৬৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। সরকারের এসব অনুদান সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা মহামারি ব্যবস্থাপনায়ও সরকার নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হাসপাতালের অবকাঠামোগত দিক ও রোগীর সংখ্যাধিক্যের কথা চিন্তা করে সারা দেশে হাসপাতালসমূহকে কোভিড ও নন-কোভিড এ দুভাগে বিভক্ত করে রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও চিকিৎসা সুরক্ষা সরঞ্জাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী সরবরাহ করা ও চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্রেনিংয়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একইসঙ্গে কোভিড রোগীর চিকিৎসার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'চিকিৎসা গাইডলাইন' প্রস্তুত করা হয়। মহামারি মোকাবিলায় লোকবল সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুততার সাথে চিকিৎসকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। সময়ের সাথে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে কোভিড চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাস্থ্য খাতে ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় ১০ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সারের ভরতুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের জন্য ১০০ কোটি টাকা, বীজের জন্য ১৫০ কোটি টাকা এবং কৃষকদের জন্য আরো ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাসের সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতিকে চাঙা রাখতে বিভিন্ন খাতে মোট প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকার ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, যা দেশের মোট জিডিপি'র ৪ দশমিক ০৩ শতাংশ।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ছয় প্রস্তাব

সম্প্রতি জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে করোনা মহামারির কারণে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় উঠে আসা দেশগুলোর জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত নতুন আন্তর্জাতিক সহায়তার ব্যবস্থা রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক্ষেত্রে ২০২০ এজেন্ডা, প্যারিস চুক্তি, আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা এই সংকট কাটিয়ে ওঠার হাতিয়ার হতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘকে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে যেতে হবে। তিনি কোভিড-১৯ সংকটের মোকাবিলা করতে আরো উন্নত সমন্বিত রোডম্যাপ তৈরি করার জন্য বিশ্বনেতাদের সামনে ছয় দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। দফাগুলো হলো:

প্রথম: জি-৭, জি-২০, ওইসিডি দেশগুলো, এমডিবি এবং

আইএফআইগুলোকে অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিতে হবে এবং ঋণ মওকুফে পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের ৭ শতাংশ ওডিএ প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ্বিতীয়: আমাদের আরো বেশি বেসরকারি অর্থ ও বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরিয়ে নিতে হবে। ডিজিটাল বিভাজন বন্ধ করার জন্য আমাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয়: কোভিড-১৯-এর পরবর্তী শ্রম বাজারে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের সহায়তা করার মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহের নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীত মুখে নেওয়ার জন্য সঠিক নীতিমালা করার পদক্ষেপ প্রয়োজন।

চতুর্থ: উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোকে অবশ্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য শুল্ক এবং কোটামুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তি সহায়তা এবং আরো প্রবেশযোগ্য অর্থায়নের বিষয়ে তাদের অদম্য প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

পঞ্চম: কোভিড-১৯ মহামারির কারণে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর যাতে পেছনে যেতে না হয়, এজন্য অন্তত ২০৩০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ষষ্ঠ: জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড এবং স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ সংগ্রহে আরো জোর প্রচেষ্টা করা দরকার।

করোনা ভ্যাকসিন

৪ঠা জুন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (গাভি) আয়োজিত ভ্যাকসিন সামিটে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে তিনি দ্রুত ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং সংস্থাটির তহবিল বাড়াতে অনুদান দিতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। সরকার ইতোমধ্যে করোনা ভ্যাকসিন সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করেছে। 'এটি যে জায়গায় উদ্ভাবিত হবে, আমরা সেখান থেকে এটি সংগ্রহ করব। এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আন্তরিক' বলে জাতিকে আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জাতিসংঘের ৭৫তম অধিবেশনে এক ভার্চুয়াল বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, 'বিশ্ব শিগগিরই কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন পাবে। এই ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সকল দেশ যাতে এই ভ্যাকসিন সময় মতো এবং একইসঙ্গে পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কারিগরি জ্ঞান ও মেধাসত্ব প্রদান করা হলে এই ভ্যাকসিন বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে।'

করোনাকালে বাংলাদেশের অর্থনীতি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সম্প্রতি জানিয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর গতি বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক। তারা আভাস দিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আগামী জুনে শেষ হতে যাওয়া অর্থবছরে এ দেশের অর্থনীতিতে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে।

করোনা ভাইরাস মহামারি কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে । এক্ষেত্রে আশা দেখাচ্ছে পোশাক খাত ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি যেখানে প্রায় ৮৩ শতাংশ কমে ৫২ কোটি ডলারে নেমে গিয়েছিল, সেখানে জুলাই মাসে তা দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ৩৯০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া মে-জুন সময়ে আমদানি বেড়েছে প্রায় ৩৬ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, আগস্টে রপ্তানি এক বছর আগের তুলনায় ৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ২৯৬ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে । জুলাই ও আগস্ট মিলিয়ে মোট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৫৭০ কোটি ডলারের। এ সময়ে মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ২,০৬৪ মার্কিন ডলার। এ থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা

করোনা সংকট মোকাবিলায় দ্রুত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ায় দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হচ্ছেন শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী *ফোর্বস* ম্যাগাজিনসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। ২৪শে এপ্রিল এক আর্টিকেলে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে বিখ্যাত ম্যাগাজিন *ফোর্বস*। একইসঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেরও। শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ১৬১ (১৬ কোটির বেশি) মিলিয়ন মানুষের বাস। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দক্ষতার সঙ্গে সংকট মোকাবিলা করা তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। এরই ধারাবাহিকতায় করোনা মোকাবিলায়ও তিনি নিয়েছেন দ্রুত পদক্ষেপ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও প্রশংসা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের জনগণের জন্য আশীর্বাদ। তাঁর সঠিক নির্দেশনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে। করোনা মহামারির এই সংকটে জনগণের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যতদিন না এই সংকট কাটবে, ততদিন আমি এবং আমার সরকার আপনাদের পাশে থাকব'।

লেখক: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

নিবন্ধ

আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফসলের মাঠ

ফারিহা রেজা

জমিতে ধানের বীজ বুনে নতুন জীবনের প্রত্যাশায় লড়াই শুরু করেছেন তারা। সব ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় যেন ফুটে উঠেছে বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠে মাঠে।

নিজ উদ্যোগে ঋণ নিচ্ছেন কৃষকরা। ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন অনেকে। সেক্ষেত্রে পাচ্ছেন সরকারি সহায়তা। আমন চারা রোপণের পাশাপাশি শাকসবজি, শীতের ও বারোমাসি তরকারি এবং মরিচ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। সরকারি হিসাব মতে, এবারের বন্যায় ১ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সারা দেশে ৩৪ জেলায় মোট ১ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর জমির ফসল সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়েছে। ৭৪ হাজার হেক্টর জমির ফসল বন্যায় ভেসে গেছে। সরকারি হিসাবে দেশে এবার ৯ লাখ কৃষক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ফসলের জমি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত এবং কৃষকসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে এবং দেশ দানাদার জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেয়েছে এবং সম্প্রসারিত চাষাবাদের প্রয়োজনে চলমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে অতিরিক্ত ১ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া ও ২ লাখ মেট্রিক টন ডিএপি সার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়েছে। চলমান অর্থবছরে ইউরিয়া ২৫ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, ডিএপি ১৫ লাখ মেট্রিক টন, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম প্রভৃতিসহ সকল রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ মেট্রিক টন।

বন্যায় সরকারি-বেসরকারি নানা পর্যায় থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন কৃষকরা। বন্যার পরে সরকারি সহযোগিতা বেশি মাত্রায় লক্ষণীয় হয়। তাই কৃষকরা আর একা নন। তাদের পাশে আছে সরকার। বন্যা-পরবর্তী সময়ে কৃষকরা কীভাবে নতুন করে জীবন শুরু করবেন, জমিতে ফসল ফলাবেন সেই লড়াইয়ে পাশে থাকছে সরকার। সরকারিভাবে ধানের চারা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকদের এই সময়ে সংসার চালানো, জমি তৈরি করা, নতুন ফসল লাগানোতে পাশে থাকছে স্থানীয় প্রশাসন। এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

দেশে মোট ফসলের ৮৫ ভাগ উৎপাদন করেন ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা। চারা উৎপাদন, ফসলের পরিচর্যা, জমির পরিচর্যা এমনকি ফসল কাটা, মাড়াই, সংরক্ষণ– সব ক্ষেত্রে কৃষকরা সীমাহীন শ্রম দেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, সরকার বর্তমান সময়ে কৃষকদের মাঠে আমন ধানের চারা ও মাসকলাইয়ের বীজ, শাকসবজির বীজ ইত্যাদিতে প্রণোদনা দিচ্ছে। বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে যথেষ্ট আমন ধানের চারা বন্যামুক্ত এলাকার মানুষ পাচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এই মন্ত্রণালয় কৃষিজীবীদের কল্যাণে যেসব কর্মসূচি নিয়েছে তাতে বন্যার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে এবং আমন ধানের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন যাবে। এবারের বন্যায় আউশ, আমন ধান, সবজি ও পাটসহ বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি কমিয়ে আনতে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিকল্প বীজতলা তৈরি, ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে বিকল্প ফসলের চাষের ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে আবহাওয়া মনিটরিংয়ের প্রস্তুতি চলছে, যাতে করে বন্যার ফলে ফসলের ক্ষতি মোকাবিলা করা যায়।

জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে কৃষকদের সংগ্রাম। বরাবরের মতো কুড়িগ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যায়। এই জেলার ধরলা নদীর দুইধারে ৩৫ কিলোমিটার এলাকার ১৩টি ইউনিয়ন সবজি আবাদের জন্য বিখ্যাত। জামালপুর এলাকার কৃষকরাও বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় ধান, পাট, আখ, ভুট্টা, শাকসবজি ও রোপা-আমন ধানের বীজতলা নষ্ট হয়েছে। জেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, এর ফলে ১৪০ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষকের। বন্যা কবলিত এলাকা নওগাঁ। মাছসহ অন্যান্য ফসলের ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ জেলার রানীনগর, আত্রাই মান্দা উপজেলার ৯টি স্থানে বাঁধ ভেঙে প্রায় ৪০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল। প্রায় ৪ হাজার হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় ভেসে গেছে কয়েকশ পুকুরের কোটি কোটি টাকার মাছ। এ জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা মান্দা, আত্রাই ও রানীনগরে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ধান লাগানোর পাশাপাশি কৃষি বিভাগের পরামর্শে বাড়ির উঠানে সবজি চাষ শুরু করেছে। সরকারি সূত্রে জানা যায়, গাইবান্ধা জেলায় ৬টি উপজেলায় ২৪৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র জানায়, ১ম পর্যায়ে ২৫শে জুন থেকে ৯ই জুলাই পর্যন্ত অতিবৃষ্টিতে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও নদনদীর পানি বৃদ্ধির কারণে বন্যায় রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, রাজশাহী, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল জেলাসহ মোট ১৪টি জেলায় ১১ জাতের ফসলের প্রায় ৭৬ হাজার ২১০ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই মধ্যে ৪১ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১ই জুলাই থেকে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, নাটোর, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ , সিরাজগঞ্জ, পাবনা, শেরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ মোট ২৬টি জেলায় ১৩ জাতের ফসলের প্রায় ৮৩ হাজার হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর ব্যাংকগুলো জানায়, করোনার সময়ে ফসলের ওপর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকা। আর উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৪৬ জন কৃষক ও কৃষি খামার। শুধু আগস্ট মাসে বিতরণ হয়েছে ২৭৬ কোটি টাকা এবং উপকৃত হয়েছে ৪৩ হাজার ২১২ জন কৃষক ও কৃষি ফার্ম। ফসল উৎপাদনের জন্য মোট এক লাখ ১২ হাজার ৪৫৯টি আবেদন ৩০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা হয়েছিল। আবেদন গৃহীত হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ১৭১টি। আবেদন গ্রহণের হার ৯৭ দশমিক ৯২। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন কৃষকরা। আর তাদের পাশে রয়েছে প্রশাসন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

ছড়া-কবিতায় বঙ্গবন্ধু

মুহাম্মদ ইসমাঈল

বাঙালি জাতির পিতা, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও ছড়া-কবিতা বাংলা সাহিত্যকে করেছে আরো সমৃদ্ধশালী। স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলা সাহিত্যের বেশির ভাগ সাহিত্যিক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখেছেন। বাংলা সাহিত্য ছাড়াও চীনা, জাপানি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয়েছে। ১৯৭১ সালে আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাগাজিন *News Week* বঙ্গবন্ধুকে 'The Poet of Politics' ঘোষণা করে। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে ডকুমেন্টারি হেরিটেজ (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে শ্রেষ্ঠ ভাষণে তালিকাভুক্ত করেছে। যে ভাষণগুলো পুরো দুনিয়া পরিবর্তন করেছে, তার মধ্যে একটি হলো ৭ই মার্চের ভাষণ। এটি শুধু একটি ভাষণ নয়, এটি একটি আবৃতিযোগ্য শ্রেষ্ঠ কবিতা, যার প্রতিটি শব্দ চয়ন মানবদেহ আন্দোলিত করে, শিহরণ জাগায়। আধুনিক বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর মতো কোনো রাষ্ট্রনায়ককে নিয়ে এত সাহিত্য কোথাও রচিত হয়নি। ১৯৭১ সালে কবি অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

কবি নির্মলেন্দু গুণের অনেক রচনা রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। 'আমি আজকে কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবিতায় তিনি লিখেছেন–

একটি গোলাপ ফুল গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।

তার আরেক ঐতিহাসিক 'স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুকে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি অভিধা দিয়েছেন। কবি মহাদেব সাহা লিখেছেন– 'শেখ মুজিব আমার নতুন কবিতা'। কবি আল মাহমুদ লিখেছেন– 'তিনি যখন বললেন 'ভাইসব'/ গাছেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল/ কবিরা বুলেট আর কলমের পার্থক্য ভুলে দাঁড়িয়ে গেল এক লাইনে'।

বাংলা সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু অর্জন করেছেন স্থায়ী স্থান। সাহিত্যের সেরা গল্পের মধ্যে কবি আবুল ফজলের 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নিহত মুখ', সৈয়দ শামছুল হকের 'নিয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়', ইমদাদুল হক মিলনের 'রাজার চিঠি', 'মানুষ কাঁদছে', হুমায়ূন আজাদের 'যাদুকরের মৃত্যু'– এসব বিখ্যাত গল্প বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা। এছাড়া 'দেয়াল', 'দুধের গেলাসে নীল মাছি', 'জনক-জননীর গল্প', 'ভয় নেই', 'রাজদণ্ড', 'শেষ দেখা' ইত্যাদিও শেখ মুজিবকে নিয়ে লেখা।

বঙ্গবন্ধুর ওপর বেশ কজন বাঙালি কবির লেখা কবিতা থেকে উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তিসমূহ বক্ষ্যমাণ অংশে চয়ন করা হলো। আবহমান বাংলার খ্যাতিমান পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'বঙ্গবন্ধু' কবিতায় লিখেছেন– 'মুজিবুর রহমান/ ঐ নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি উগারী বান।/ বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেঁয়ে, / জ্বালায় জ্বলিছে মহাকালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।... তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া শাসন-ত্রাসন-ভয়, / আমরা বাঙালী মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয়।'

সিকান্দার আবু জাফর 'ফিরে আসছেন শেখ মুজিব' কবিতায় লিখেছেন– 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর কান্নার পাথরে গড়া/ সুমসৃণ পথে ফিরে আসছেন বঙ্গ-ভারতের/ সম্মিলিত রক্তস্নাত মহাপূণ্য পথে/ বাংলাদেশের মরণ-বিজয়ী মুক্তিসেনানী।' ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে কবি তাঁর 'ফিরে আসছেন শেখ মুজিব' কবিতায় এই পঙ্‌ক্তি বিধৃত করেন সেকালের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙালি জাতির আবেগ-উচ্ছ্বাস আর ভালোবাসার প্রকাশ ও চেতনা-চিৎপ্রকর্ষের ইঙ্গিত থেকে। কবি বেগম সুফিয়া কামাল 'ডাকিছে তোমারে' কবিতায় লিখেছেন– 'এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী/ ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি/ হেরিতে এখনো মানব হৃদয়ে তোমার আসন পাতা/ এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা-পিতা-বোন-ভ্রাতা। ... তোমার শোণিতে রাঙানো এ-মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি/ তাইতো তোমারে ডাকে বাংলার কানন, গিরি ও নদী।' ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কতিপয় পথভ্রষ্ট সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর কবি সুফিয়া কামাল এই কবিতাটি রচনা করেন। কবি সুফিয়া কামালের কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে স্বজন হারানোর ব্যথা মর্মে মর্মে বাজে। কবি আবুল হোসেন তাঁর 'থাকো, আরও কিছুদিন থাকো' কবিতায় লিখেছেন– 'চিরকাল যদি না-ই থাকো, আরও/ কিছুদিন থাকো আমাদের সঙ্গে,/ দিয়ে যাও আলো আর কিছু গান,/ হাসিখুশিহীন এ স্বাধীন বঙ্গে।' কবি আবুল হোসেন মনে-প্রাণে কামনা

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

করেছিলেন বঙ্গবন্ধু আরো অনেকদিন জীবিত থাকবেন। এজন্য কবি তাঁর কবিতায় আশীর্বাদ কামনা করেছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম পরিহাস। হায়েনারা বঙ্গবন্ধুকে বেশিদিন বাঁচতে দেয়নি। কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতায় লিখেছেন– 'ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর পতাকার মতো/ দুলতে থাকে স্বাধীনতা,/ ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর ঝরে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।' সব্যসাচী লেখক ও কবি সৈয়দ শামসুল হক 'মুজিব! মুজিব!' কবিতায় লিখেছেন– 'কুটিরে পাথারে নগরে ও গ্রামে পায়ে পায়ে হেঁটে যায়– অবিরাম হেঁটে চলেছে মুজিব রক্তচাদর গায়।/ মুজিব! মুজিব! জনকের নাম এত সহজেই মোছা যায়!' কবি রফিক আজাদ তাঁর 'পাঠ্য বইয়ে যে কথা নেই' কবিতার শেষার্ধে লিখেছেন– 'এদেশেরই ধূলিকণায় অঝোর ধারায় থাকবে যে নাম বহমান,/ প্রিয় সে মুখ আর কেউ নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবিতায় দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন– 'সমবেত সকলের মত আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালবাসি,/ রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ/ গতকাল আমাকে বলেছে,/ আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।/ আমি তার কথা বলতে এসেছি।' কবি মহাদেব সাহা তাঁর 'মুজিব ফিরে আসে' কবিতায় লিখেছেন– 'যখন ভোরে আকাশ জাগে শিশির পড়ে ঘাসে/ পাখি ডাকা সেই সকালে মুজিব ফিরে আসে,/ নদীর বুকে বৃষ্টি নামে যখন ওঠে ঢেউ/ মুজিব বলে, আসছি আমি, ডাকছে আমায় কেউ।' কবি আসাদ চৌধুরী তাঁর 'দিয়েছিলেন অসীম আকাশ' কবিতায় লিখেছেন– 'সেই দুঃসময়ে/ খরখরে খরায়/ গাছ-ওপড়ানো ঝড়ের মধ্যে/ তুমি একটি নির্মল আকাশের স্বপ্ন বুনেছিলে/ আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে।' কবি কামাল চৌধুরী তাঁর 'সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল' কবিতায় লিখেছেন– 'সেই মুখখানি স্বাধীনতা প্রিয় ছিল/ সেই মুখখানি মিছিলে মানব হতো/ উত্থিত হাতে স্লোগানে চলায় মিলে/ সেই মুখখানি অগ্নির সাথি ছিল।' কবি ও ছড়াকার আলম তালুকদার তাঁর 'মহান মুজিবুর' ছড়ায় লিখেছেন– 'বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়/ নেই হিসাবে ভুল।/ কোনটা দোয়েল কোনটা কোকিল/ কণ্ঠে বুঝি সুর/ তেমনিভাবে চিনতে পারি/ মহান মুজিবুর।' আলম তালুকদার মূলত একজন শিশুতোষ সাহিত্যিক। শিশুদের জন্য তাঁর অনেক লেখা রয়েছে। কবি তালাত মাহমুদ তাঁর লেখা 'অঙ্গীকার' কবিতায় প্রথম প্রতিবাদী উচ্চারণ করেছেন এভাবে– 'আমার চন্দ্রকে ওরা হত্যা করেছে/ হত্যা করেছে অনেক তারার একটি আকাশ/ আমার সূর্যকে ওরা গ্রেফতার করেছে/ গ্রেফতার করেছে রক্তরাঙা একটি ইতিহাস।' কবি ও ছড়াকার আনজীর লিটন তাঁর 'জাদুকর' ছড়ায় লিখেছেন– 'কোন জাদুকর তুমি?/ আমার কোন জাদুকর তুমি?/কোন জাদুতে এনে দিলে লাল সবুজের ভূমি?/ বলল হেসে বঙ্গবন্ধু–/ আমি হলাম সেই জাদুকর/ বাংলার অন্তরে/ রাঙা স্বপন দেই জাগিয়ে/ বাঙালিদের ঘরে।'

আরেক বিখ্যাত কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সমস্ত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা;
সুপুরুষ ভালবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা;
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা;

ছড়াকার মাহমুদ উল্লাহ 'পল্টনে শেখ মুজিব' কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

আমরা ক'জন তরুণ ছিলাম এই শহরের বুকে
নতুন দিনের স্বপ্ন ছিলো সবার চোখে-মুখে।

কবি স.ম. শামছুল আলম 'একটি ভাষণ' নামে তাঁর কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

একটি ভাষণ অজর কবিতা রণসংগীত
সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালির ভিত
একটি আশার বাণী

একটি ভাষণ রঙিন স্বপন
মুখের হাসিতে কান্না মেশানো দুচোখের ঝরা পানি।

ছড়াকার আমিরুল ইসলামের ছড়া 'শেখ মুজিব'-এর চরণে আমরা পাই–

তুমি আমাদের হাজার বছরে
একটি আলোর দ্বীপ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

কবি আসলাম সানী বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দারুণভাবে চয়ন করেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কেবল বঙ্গবন্ধু হত্যাই আমাকে বেশি ছোঁয়'–

আমি খুব ভালো কবিতা বুঝি না তবে
সাতই মার্চের ঐতিহাসিক কবিতা খুব ভালো বুঝি
আমি খুব গান বুঝি না তবে
জয় বাংলা শব্দটি আমার একটি প্রিয় গান।

বিখ্যাত ছড়াকার ফারুক নওয়াজ তাঁর 'সেই ভাষণ' কবিতায় এইভাবে তুলে ধরেছেন–

একাত্তরের মতই মার্চে ঘরে ছিল না তো কেউ
রেসকোর্সের মাঠে নেমেছিল গণজোয়ারের ঢেউ
স্বদেশ সদ্য কণ্ঠরুদ্ধ অধীর অপেক্ষায়
মধ্য দুপুর সূর্য উপুড় সময় গড়িয়ে যায়।

কবি হাসান আলীম তাঁর 'জাতির পিতা' কবিতায় লিখেছেন এভাবে–

মহান নেতা মহান নায়ক
জাতির পিতা শেখ মুজিব
লক্ষ কোটি বক্ষ মাঝে
জলন্ত তুমি চিরঞ্জীব।

কবি আখতার হুসেনের 'তুমি মুজিবর' ছড়ায় আমরা পাই–

তুমি মুজিবর, আত্মার স্বর
তুমি তো দেশ, তুমি প্রতি ঘর।

সমসাময়িক যুগের নারী কবি কাজী রোজী তাঁর 'ভিন্ন আকাশ খুঁজছি' কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেছেন এভাবে–

সেই থেকে একটি ভিন্ন আকাশ খুঁজছি
যেখানে পঁচাত্তরের পরে
সিঁড়ি ভাঙ্গা অন্ধের মতো
বারবার সেই সিঁড়িতেই থমকে দাঁড়ায় সব।

ছড়াকার গোলাম নবী পান্না বঙ্গবন্ধুকে এইভাবে মূল্যায়ন করেছেন তাঁর 'বঙ্গবন্ধু তিনি' কবিতায়–

দেশ ও জাতির টানে নেতার
কাঁদে যখন মন
দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে খোঁজেন
শান্তি সারাক্ষণ।

ছড়াকার কামাল হোসাইন তাঁর 'মুজিব তোমার জন্যে' কবিতায় কী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

বাংলা নামের দেশ পেয়েছি
সুখ-শান্তির রেশ পেয়েছি
বাঁচার পরিবেশ পেয়েছি
কার জন্যে
তাঁর জন্যে।

ছড়াকার মালেক মাহমুদ তাঁর 'বঙ্গবন্ধু তিনি' কবিতায় এভাবে চয়ন করেছেন–

আমার বন্ধু তোমার বন্ধু
দুখীর বন্ধু কর্মে
স্বাধীনতার বাংলা হাসি
বুঝতে পারি মর্মে।

কবি মুহাম্মদ ইসমাঈল তাঁর 'বিশ্বে মহান নেতা' কবিতায় লিখেছেন–

গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় নেতা তোমার গ্রাম
কে জানতো একদিন তুমি কুড়াবে সুনাম
সত্যি তুমি দারাজকণ্ঠে আনলে স্বাধীনতা
তোমার মতো ক'জন আছে বিশ্বে মহান নেতা।

ছড়াকার ইব্রাহীম মিজির 'মুজিব মানে' ছড়ায় আমরা দেখতে পাই–

মুজিব মানে আর কিছু নয়
কালজয়ী এক নাম,
বুকের মাঝে অঙ্কিত যার,
স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এভাবেই বাংলাদেশ তথা বিশ্বের কবিদের কবিতায় চয়ন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর যাপিত জীবন নিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরো যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, সরকার আমিন, হারুনুর রশীদ, দিলওয়ার, কায়সুল হক, রাশেদ রউফ, খালেক বিন জয়েনউদদীন, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, হায়াৎ মামুদ, রুবী রহমান, আবিদ আজাদ, দাউদ হায়দার, ত্রিদিব দস্তিদার, আসাদ মান্নান, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, খালেদ হোসাইন, রহীম শাহ, পিয়াস মজিদ, শাহ সিদ্দিক, আব্দুস সবুর খান, ধ্রুব এষ, আলী ইমাম, খায়রুল আলম সবুজ, ব্রত রায়, লুৎফর রহমান রিটন, আনিসুল হক প্রমুখসহ নাম না জানা আরো অনেকে। বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে যেমন আছেন, আমাদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কাজ এদেশের মানুষের জন্য নিবেদিত। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

রাজধানীর পূর্বাচলে দৃষ্টিনন্দন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। ১২ই অক্টোবর এর নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে জাতির পিতার জন্ম থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যা পর্যন্ত ইতিহাস তুলে ধরা হবে। বঙ্গবন্ধু স্কয়ার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল দায়িত্ব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরে মন্ত্রণালয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এর নির্মাণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করে। রাজউক স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রণীত নকশা অনুযায়ী স্থাপনাটি নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ১৫নং সেক্টরের ২০৩নং সড়কের ১৭ নম্বর প্লটে ২ দশমিক ৩১৯ একর জমিতে নির্মিত হচ্ছে ঐতিহাসিক এ স্থাপনা। এর নির্মাণে মোট খরচ হবে ৫৫ কোটি ১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

প্রতিবেদন: রিফাত হাসান

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস

সানিয়াত রহমান

সম্প্রতি ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (সংশোধনী) গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। ১৩ই অক্টোবর আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা থেকে এ গেজেট প্রকাশ করা হয়। এই অধ্যাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২০ নামে পরিচিত হবে। ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অধ্যাদেশ স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটি আইনে পরিণত হলো। নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরু হলে এই আইনটি পাস করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের এই খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি এতদিন ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন– যা এখন সংশোধিত আইনে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বর্তমান আইনে ধর্ষণের অপরাধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিচারক মৃত্যুদণ্ডের রায় দিতে পারবেন। সংশোধিত আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার পাশাপাশি আরো দুটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এর মধ্যে একটি যৌতুকের ঘটনায় মারধরের ক্ষেত্রে (ধারা ১১-এর গ) সাধারণ জখম হলে তা আপোশযোগ্য বিবেচিত হবে। তাছাড়া এ আইনের চিলড্রেন অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর (ধারা ২০-এর ৭) পরিবর্তে শিশু আইন ২০১৩ প্রতিস্থাপিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেন, ধর্ষকের পাশবিকতা রুখতেই তাঁর সরকার আইন সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারা দেশে প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের মধ্যে জরুরি বিবেচনায় আইনটি সংশোধন করা হয়। ধর্ষকদের পশুবৃত্তির কারণেই এই পাশবিকতা, যার ফলে আজ আমাদের মেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত। সেই জন্য আইনটি সংশোধন করি।

২৫শে নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। শুধু আইন দিয়ে নয়; নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে সমাজের সব পক্ষের মানুষকে সমবেতভাবে মানবতার ওপর এই আক্রমণকে রুখতে হবে।

নারীর প্রতি নির্যাতন এবং নির্যাতন শেষে হত্যার মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাবার ফলে সমাজে এই ব্যাধি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এই দিক বিবেচনা করে সরকার নারী ধর্ষণ ও ধর্ষণ শেষে হত্যার শাস্তি যাবজ্জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড। একজন নারী যে বোনের মমতা, মায়ের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় মেশানো মানুষ– সেটার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সামগ্রিকভাবে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। আওয়াজ তুলতে হবে নির্যাতনের বিরুদ্ধে। রুখে দাঁড়ানো ছাড়া পথ আর নেই। প্রশাসনের সহযোগিতা এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। নারী নির্যাতন

প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন জরুরি। পরিবার ও শিক্ষাঙ্গনে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে একসঙ্গে কঠোর হতে হবে।

গণপরিবহণে নারীদের হয়রানি নিয়ে ব্র্যাকের গবেষণায় উঠে এসেছে কিছু তথ্য। এতে বলা হয়েছে– ৯৪ ভাগ নারী নানাভাবে হয়রানির শিকার হন। এই হয়রানির জন্য যারা দায়ী তাদের বড়ো অংশ ৪১ থেকে ৬০ বছর বয়সি পুরুষ। শতকরা হিসেবে তারা মোট পুরুষদের ৬৬ ভাগ।

বিদেশে নারী শ্রমিকরা খুব একটা নিরাপদ নয়। ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ৬০ জন নারী শ্রমিকের মরদেহ দেশে এসেছে। মাত্র ৪ বছরে ৫০-এর অধিক নারী শ্রমিক দেশে এসেছেন ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার হয়ে। যারা ফিরে এসেছেন তাদের প্রধান অভিযোগ– শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)-এর জরিপে দেখা গেছে, গৃহে স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৬৫ শতাংশ নারী। এছাড়া ৩৬ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতন ও ৮২ শতাংশ নারী মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পক্ষকালব্যাপী দেশে পালিত হচ্ছে। পালিত হচ্ছে জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। ২৪শে আগস্ট পালিত হয় জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। ১৯৯৫ সাল থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হয়। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৯৮১ সালে আমেরিকায় নারীদের এক সম্মেলনে ২৫শে নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। জাতিসংঘ দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ১৯৯৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৯৭ সাল থেকে এই দিবস ও পক্ষ পালন করে আসছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবনের পরিবর্তে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডের আইন পাস হওয়ার ফলে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হবে না– এটা আপামর জনগণের বিশ্বাস। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

আন্তর্জাতিক সর্প দংশন সচেতনতা দিবস

রাবেয়া নূর

সাপে কাটলে ওঝা ডাকার প্রথা দেশে বিদ্যমান। সত্যিই কি ওঝা সর্প দংশনের বিষ নামানোর জন্য সঠিক ব্যক্তি? চিকিৎসকসমাজ এ কথা মানতে চান না। তাদের কথা চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রথম ও শেষ কথা। প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক সর্প দংশন সচেতনতা দিবস' পালন করা হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সর্প দংশন সচেতনতা দিবস' পালিত হয়েছে। সচেতনতার জন্য পত্রপত্রিকায় ব্যাপক বিজ্ঞাপন এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন দেয়ালগাত্রে পোস্টারিং হয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– সর্প দংশনের চিকিৎসা আছে সরকারি হাসপাতালে, সবখানে।

সর্প দংশন প্রতিরোধে করণীয়

(ক) বাড়ির আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার রাখুন, ঘুমাবার সময় অবশ্যই ভালো করে মশারি টাঙিয়ে নেবেন;

(খ) রাতে বা অন্ধকারে হাঁটার সময় অবশ্যই টর্চ ব্যবহার করবেন;

(গ) সাপে কাটলে রোগীর ক্ষতস্থানটি সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করুন;

(ঘ) সাপে কাটলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান;

(ঙ) অ্যান্টি স্নেক ভেনম সকল সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায়।

দিবসটি পালনে প্রচারসহ যাবতীয় দায়িত্ব 'নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এলসিডিপি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার ওপর ন্যস্ত।

২০১০ সালের একটি তথ্যে বলা হয়, প্রতিবছর আনুমানিক ৬ লাখ মানুষ সাপে কাটার শিকার হয়ে থাকেন। আর বছরে সর্প দংশনে ৬ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে থাকে। বছরে বন্যার পানিতে সর্প দংশনের হার বেশি হয়ে থাকে।

দেশে সাধারণত পাঁচ ধরনের বিষধর সাপ রয়েছে। যেমন: গোখরা, কেউটে, চন্দ্র বোড়া, সবুজ সাপ ও সামুদ্রিক সাপ। তবে বাংলাদেশে সামুদ্রিক বিষধর সাপের জাত নির্ধারণ করা হয়নি। উপকূলীয় অঞ্চলে এসব সাপ থাকে।

বাংলাদেশে সর্প দংশনের চিকিৎসার প্রধান সমস্যা হলো, দংশনের শিকার ব্যক্তিটিকে ওঝার ফুকফাক, বন্ধন দিয়ে ফেলে রাখা হয় এবং সর্প দংশনের পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটে। আক্রান্ত ব্যক্তির ততক্ষণে নিথর শরীরের প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে সরকারি হাসপাতালে অ্যান্টি ভেনম ইনজেকশনসহ অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

সাপের কামড় একটি দুর্ঘটনা। একইসঙ্গে একটি জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যা। শুধু আমাদের বেলায় নয় এটা আন্তর্জাতিকভাবেও সত্যি। বলা হয় উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় সর্প দংশনে প্রতিবছর ৮০ হাজার থেকে দেড় লাখ মানুষ সাপের কামড়ে প্রাণ হারান। পাশাপাশি বেঁচে যায় অনেক আক্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু থেকে যায় নানা উপসর্গ। বলা হয়ে থাকে সর্প দংশনের শিকার ব্যক্তিটি বেঁচে গেলেও তারা স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্বের শিকার হন। সঙ্গে যোগ হয় মানসিক সমস্যা।

বর্তমান সরকার সর্প দংশনে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার ফলে সর্প দংশনে আহত ব্যক্তি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

খান চমন-ই-এলাহি

আগরতলা ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে
একদিন বিদ্রোহী বাংলায়
স্বাধীনতা আসবেই;
তুমুল যুদ্ধের পর
বিচারও ব্যর্থ হলো
প্যারোলে নয়, নেতা ফিরে এলেন
হৃদয় গভীরে একটি পতাকাসমেত।
অতঃপর পৃথিবীর মানচিত্রে
অঙ্কিত হলো বাংলাদেশ।

কবিতার মতো এগিয়ে যায় স্বপ্নের বাংলাদেশ। ভয় পায় ওরা। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি। তড়িঘড়ি করে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' নামে একটি মামলা দায়ের করে। নানা কারণেই এ মামলাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাঙালি, বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশের প্রতি আর কেউ এত দরদ, এত ভালোবাসা, এত প্রেম, এত মায়া, এত মমতা, এতটা মায়ের সাথে সন্তানের টান আর কেউ অনুভব করেনি। হাজার বছরে কেউ শ্যামল, সবুজ, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, মধুমতী, বাইগার, ঘাঘর, কুমার, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ কিংবা হরিণঘাটা বা পিয়াইনের অববাহিকায় জন্ম নিয়ে জেল-জুলুম, অত্যাচার-অবিচার আর মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে বাঙালি ও বাংলা মায়ের কথা বলেনি। বাঙালি আগে কখনো বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি। তারা দেখেনি শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নামে রাষ্ট্র বাদী হয়ে মামলা দিয়ে শাসন করতে চায়, আবহমান বাংলার স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চায়। বাঙালি আর মাথা উঁচু করে না দাঁড়ায় সেজন্য মুজিবভক্ত বাঙালিদের জীবন কেড়ে নিতে চায়। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার নামে মুজিবকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারতে চায়। তাঁর অনুসারীদের জীবন কেড়ে নিয়ে, সম্ভাবনা বিনষ্ট করে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে। তবুও বাস্তুচ্যুত করে, সম্পদ-সম্মান কেড়ে নিয়ে স্বাধিকার থেকে স্বায়ত্তশাসন এবং স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার দাবি ভুলিয়ে দিতে পারে না। বাঙালির কণ্ঠে বজ্রের নিনাদ। পাকিস্তানিদের হুঙ্কার জনগণ ভয় পায় না, রক্তচক্ষু বাঙালির জানা। বাঙালি জানে মৃত্যুকে জয় করে স্বাধীনতা পাওয়ার কথা। দুর্যোগ-আক্রমণ প্রতিহত করেই বাঙালি পৃথিবী নামক ভূখণ্ডে বাংলার জনপদে টিকে ছিল, টিকে আছে এবং চিরকাল থাকবে। শেখ মুজিবের হাত ধরে, জাতির পিতার দেখানো পথে চিরকালীন কর্তব্য আয়ত্ত করতে পেরেছে একাত্তরের বীর বাঙালি, মুক্তিযোদ্ধা বাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাঙালি। কালের যাত্রায় এখানে আর কেউ বাঙালিকে অবদমিত করতে পারবে না। পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে বাধ্য করতে পারবে না। পাকিস্তানি সেনাদের পরাজিত করে বাঙালি বিশ্বসভায় নিজের আসন পাকা করেছে। বাঙালি ও বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা এখন পৃথিবীর সর্বত্র। একটি মামলা তাই সামান্য বিষয়মাত্র নয়– অনেক বড়ো বিষয়। এই মামলাটি একটি ভুল। সরকার এই মামলার মাধ্যমে আরো একবার প্রমাণ করেছিল পাকিস্তানের রাজনীতি পশুত্বের দ্বারা পরিচালিত। অস্বাভাবিকভাবে এগোতে চাইত পাকিস্তান। এমনকি তারা লাহোর প্রস্তাবকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। ভাষাকে উপেক্ষা করে জিন্নাহ-লিয়াকত আলী যে ভুল করেছিল, যে অবহেলার শুরু করেছিল তার ফল পাকিস্তানকে ভোগ করতে

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলখানা থেকে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু

হয়েছে। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই মামলাটি বাঙালিকে আরো একবার মনে করিয়ে দিয়েছে বাংলা ও বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের পাশবিক শক্তির পাশে মানবিক গুণ নিয়ে বেশি দিন থাকতে পারে না।

পাকিস্তানি শাসকচক্রের দেওয়া সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' হলেও এ মামলাটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। আসলে এ মামলাটির নামকরণ বঙ্গবন্ধু ভিন্নভাবে করেছেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের চরিত্রের সাথে মিলিয়ে নামকরণ করেছেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা'। যা হোক, ইসলামাবাদের ষড়যন্ত্রের কথা বাঙালি প্রথম জানতে পারে ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি। সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বলতে থাকে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে কোনো প্রচার না করে গোপনে প্রথম দেশব্যাপী দেড় হাজার নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে গ্রেপ্তার কার্যক্রম। সরকার আওয়ামী লীগের দুজন নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুজন কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। ব্যাপারটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালায় পাকিস্তান সরকার। তারা একধাপ অগ্রসর হয়ে ১৮ই জানুয়ারি ঘোষণা করে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত হওয়ার বিষয়টি। তারা বঙ্গবন্ধুকে এ মামলাটিতে এক নম্বর আসামি করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' মামলাটি বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিল এক নোটিফিকেশনে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অর্ডিনেন্স অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে পাকিস্তান সরকার প্রহসনমূলক বিচারের ব্যবস্থা করে, যেখানে অন্যায়ভাবে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন অভিযুক্তকে বিচারের সম্মুখীন করে। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার

কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন সকালে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি এস.এ. রহমান এবং অপর দুইজন সদস্য ছিলেন এম.আর. খান ও মকসুমুল হাকিম। বাঙালি হিসেবে খান ও হাকিম সাহেব পাকিস্তানি সরকারের পক্ষে নিপীড়নমূলক বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে অভিযুক্তদের পক্ষে সর্বমোট ২৬ জন কৌসুলি নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম খান এবং একটি সেশনের জন্য বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে এসে আইনি লড়াই করেছিলেন প্রখ্যাত কৌসুলি টমাস উইলিয়ামস (কিউ.সি.)। বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্ত অন্যদের পক্ষে আরো যে সকল বিজ্ঞ আইনজীবী সহায়তা করেন তাঁরা হলেন– আমীরুল ইসলাম, মওদুদ আহমেদ, জহীরুদ্দিন, মশিউর রহমান, মোল্লা জালালউদ্দিন, জুলমত আলী খান, কে.জেড. আলম, ভি.আই. চৌধুরী, শওকত হোসেন, নূরুল আলম, আব্দুস সালাম, আব্দুল হাই, ময়নুল হোসেন ও মীর হোসেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবরুদ্ধ পরাধীন বাংলার মুক্তির জন্য প্রাণপণে কাজ করেছেন। সকল প্রকার অত্যাচার-অবিচার, জেল-জুলুম, নিপীড়ন সহ্য করেছেন। সকল অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধুকে জানতেন, তাঁর ত্যাগের কথা জানতেন, সে কারণে ষড়যন্ত্র নয়, বিদ্রোহের বিষয়ে শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বাঙালির অধিকারের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১নং অভিযুক্ত ছিলেন বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্য ৩৪ জন অভিযুক্ত হলেন– (২) লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, (৩) স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, (৪) সুলতান উদ্দীন আহমেদ (৫) এলএসসিডিআই নূর মোহাম্মদ, (৬) আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, (৭) এফ সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহ, (৮) প্রাক্তন কর্পোরাল আব্দুস সামাদ, (৯) প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন, (১০) রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, (১১) ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, (১২) বিভূতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, (১৩) বিধান কৃষ্ণ সেন, (১৪) সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, (১৫) প্রাক্তন হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, (১৬) প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আব্দুর রাজ্জাক, (১৭) সার্জেন্ট জহুরুল হক, (১৮) এ বি খুরশীদ, (১৯) খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান, (২০) রিসালদার এ.কে.এম. শামসুল হক (২১) হাবিলদার আজিজুল হক, (২২) মাহফুজুল বারী, (২৩) সার্জেন্ট শামসুল হক, (২৪) মেজর শামসুল আলম এ.এম.সি, (২৫) ক্যাপটেন মুহম্মদ আব্দুল মোতালেব, (২৬) ক্যাপটেন এ শওকত আলী, (২৭) খোন্দকার নাজমুল হুদা এ.এস.সি, (২৮) ক্যাপটেন এ.এন.এম নূরুজ্জামান, (২৯) সার্জেন্ট আবদুল জলিল, (৩০) মুহম্মদ মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী, (৩১) লে. এম রহমান, (৩২) সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম, (৩৩) আলী রেজা, (৩৪) ক্যাপটেন খুরশীদ উদ্দিন, (৩৫) লে. আবদুর রউফ।

সরকার প্রকৃত ব্যক্তির নাম গোপন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করে। বাঙালিদের নিষ্পেষণের সব রকম প্রক্রিয়া চালু করেছিল। এর থেকে উদ্ধার সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ডাক না দিতেন। পাকিস্তানি দণ্ডবিধির ১২(ক) এবং ১৩১ ধারা অনুসারে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাটি সকাল ১১টায় শুরু হয়। এ মামলার চার্জশিটে ১০০টি অনুচ্ছেদ ছিল। সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকারের পক্ষে ১১ জন, রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন।

এই মামলার বিষয় দু'পক্ষের দু'রকম বক্তব্য। পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায় এ কারণে যে , শেখ মুজিব ১৯৬২ সালে গোপনে আগরতলা গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে দেখা করেন। তাঁর দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ, যাতে বাংলাদেশ স্বাধীন করা যায়।

বাঙালি জানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পাকিস্তানিরা বাঙালির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে দেখে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। এর এক পর্যায়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে জড়িয়ে নানা কথা শোনায়। ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানিরা এ দুজনকে গুলি করে হত্যা করে। এ সময়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান রাওয়ালপিণ্ডিতে এক গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান শেখ মুজিবকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হননি। কোনো রকম সাময়িক মুক্তির বিরোধিতা করেন। ফলে ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমতা কুণ্ঠিত হয়, সংকুচিত হয়। প্যারোলেও কোনো ঝামেলা যাতে না হয় তারজন্য সরকারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক থেকে প্রতিবাদ করেন। যদিও মামলাটি সরকার প্রত্যাহার করে ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে, তবুও এর ক্ষত থাকে বহুকাল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণের চাপে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক এই মামলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মপক্ষ সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান করেন, যা এই মামলা সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করে। যা প্রত্যেক বাঙালিকে ও বাংলাদেশের নাগরিককে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে।

পৃথিবীতে যতদিন আলো-বাতাস থাকবে, ততদিন বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকবে। ঠিক ততদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালির জাতীয় চেতনায় সাহসের স্মারক হয়ে থাকবে।

লেখক: কবি, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আইনজীবী

শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলানটিয়ার অ্যাওয়ার্ড চালু

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্ব বিশ্বে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তা নিজ নিজ দেশে অনুসরণ করছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর থেকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে Sheikh Hasina Youth Volunteer অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়েছে বলে জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে ঢাকা ও আইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Sheikh Hasina Youth Volunteer 2020 আগামী বছর থেকে প্রদান করা হবে।

এ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল যুবক কোভিড-১৯ মোকাবিলার মানসিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দেশে এবং বিদেশে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাদেরকে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: আজমেরী হক

মানুষের কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

মিয়াজান কবীর

হে মানুষ! আদম সন্তান।
আত্মার আত্মীয় মোর বিধাতার শ্রেষ্ঠ অবদান।
তোমার সকাশে মোর আজিকার ব্যথা নিবেদন,
ভিক্ষার এ ভাণ্ডারটির রাখিয়ো না অপূরণ।
দাও-দাও-দাও তব মানবতা ভিক্ষা মোরে দাও।

'হে মানুষ' নামে এই জনপ্রিয় কবিতার জনক কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন। মানুষের কবি, মানবতার কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার চারিগ্রামে। তার বাবা-মায়ের চার ছেলে দুই মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম সন্তান। মা-বাবা, ভাইবোন মঈনুদ্দীনকে আদর করে ডাকত 'হিরু মিয়া' নামে। মঈনুদ্দীনের বাবা মোমরেজ উদ্দীন নিজ গ্রামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই পাঠশালায় মঈনুদ্দীন শিক্ষায় হাতেখড়ি নেন। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন খুবই মনোযোগী। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। মাকে হারিয়ে বাবার স্নেহ-মমতায় লালিতপালিত হতে থাকেন। বিধি বাম হলেন। বারো বছর বয়সে বাবাও শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন পরপারে।

মা-বাবার মৃত্যুতে সংসারে নেমে আসে দুঃখের ঘোর অমানিশা। দুঃখের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন মঈনুদ্দীন। একদিন দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে নিজ গ্রামের জনৈক এক ব্যক্তির বুক বাইন্ডিং কারখানায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে একজন খুদে কর্মচারী হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন বুক বাইন্ডিং কাজে।

ছোটোবেলায় বই পড়ার প্রতি মঈনুদ্দীনের ঝোঁক ছিল। বুক বাইন্ডিং কারখানায় এসে নতুন বই দেখে বিমোহিত হলেন। নতুন বইয়ের গন্ধে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নিজের হাতে বই বাঁধাই করে সারি সারি সাজিয়ে রাখেন। আবার কাজের অবসরে বাঁধাই করা নতুন বইয়ের পাতা খুলে চোখ বুলিয়ে দেখেন। লেখাপড়ার প্রতি মঈনুদ্দীনের ছিল আশৈশব আকাঙ্ক্ষা। নতুন বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, তার কচি মনে দোলা দেয়। তার মনে লেখাপড়া করার বাসনা জাগে। তিনি ভর্তি হলেন নৈশ বিদ্যালয়ে। দিনে কর্মচারী হিসেবে বই বাঁধাইয়ের কাজ করেন আর রাতের বেলায় বই হাতে স্কুলে যান। লেখাপড়ার পাশাপাশি চুপিচুপি গাঁথেন বর্ণে বর্ণে বর্ণমালা। লিখতে লাগলেন ছড়া-কবিতা।

বালক কবি মঈনুদ্দীনের সঙ্গে পথ চলতে চলতে পরিচয় হয় কলেজ পড়ুয়া খন্দকার আবদুল মজিদের সঙ্গে। কলেজ পড়ুয়া এই ছেলেটি একই মহল্লায় বসবাস করতেন। তারও সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল। সাহিত্য নিয়ে দুজন মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনা করতেন। এমনিভাবে দুজন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। দুবন্ধু মিলে একটি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেই কথা সেই কাজ। সারারাত জেগে দুজন হাতে লিখে প্রকাশ করলেন *মুসাফির* নামে একটি দেয়াল পত্রিকা। হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকাটি প্রকাশের পর মঈনুদ্দীনের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তখন তিনি তার লেখা ছড়া, কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠাতে লাগলেন। ১৩২৮ সালে মঈনুদ্দীনের লেখা 'খোদার দান' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় মাসিক *সহচর* পত্রিকায়। পত্রিকার পাতায় নিজের নাম ছাপাক্ষরে দেখে সাহিত্য সাধনায় তিনি আরো উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি নিজেই প্রকাশ করলেন 'উচিৎ কথা' নামে একটি ছোট্ট আকারে কবিতার বই।

কবি মঈনুদ্দীন সাহিত্য জগতে নিভৃতচারির মতো পথ চলতে থাকেন। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিচিতি লাভ করতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এমনিভাবে একদিন দৈনিক *নবযুগ* পত্রিকা অফিসে গিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন এবং কবির আলাপচারিতায় বিমুগ্ধ হন মঈনুদ্দীন। নজরুলের কাছে পেলেন অনুপ্রেরণা। নজরুলের কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুই মঈনুদ্দীনের

ভালো লেগে যায়। মঈনুদ্দীন কবি নজরুলকে ভালোবেসে ফেলেন। অনুসরণ করতে থাকেন কবি নজরুলের জীবনধারা। সমবয়সি বন্ধুরা তাই মঈনুদ্দীনকে 'ছোটো নজরুল' বলে ডাকতে শুরু করেন। মঈনুদ্দীন শুধু যে কবি নজরুলের পোশাক-আশাকই অনুসরণ করতেন তা নয়; তিনি নজরুলের লেখাও অনুসরণ করে লিখতে লাগলেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা লিখে জেলে গেলেন। মঈনুদ্দীন নজরুলের লেখার অনুরূপ ১৯২৩ সালের ১৩ই মে *মুসলিম জগৎ* পত্রিকায় আগুনঝরা 'বিদ্রোহ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে ব্রিটিশ রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিলেন। লেখাটি ব্রিটিশ সরকারের চক্ষুশূল হলো। ব্রিটিশ সরকার তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেয়। এই সময় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হুগলি জেলের অন্তরীণ ছিলেন। একই জেলে অন্তরীণ থাকাবস্থায় তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। একে-অপরকে ভালোভাবে জানতে পারেন। পরবর্তীতে নজরুলকে নিয়ে তার লেখা এক অনবদ্য গ্রন্থ 'যুগস্রষ্টা নজরুল' সুধী মহলে সমাদৃত হয়। এরপর প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, কবি শাহাদৎ হোসেন, সাহিত্যিক আবুল ফজল, কবি জসীমউদ্‌দীন, ডা. লুৎফর রহমান, কবি সুফিয়া কামাল, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, কবি আবদুল কাদির, আবুল মনসুর আহমদ, হাবীবুল্লাহ বাহার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। এদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় *মুসলিম জগৎ*, *ইমরোজ সাম্যবাদী* পত্রিকায় সম্পাদনা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 'আল হামরা' নামে প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। কবি মঈনুদ্দীনের লেখা 'অনাথিনী', 'মুসলিম', 'বীরাঙ্গনা', 'হে মানুষ', 'আর্তনাদ, 'পালের নাও', 'ঝুমকো লতা' প্রকাশিত হবার পর সাহিত্য মহলে সাড়া জাগে।

দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় এসে বাংলাবাজার 'আল হামরা' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন। আল হামরা থেকে প্রকাশিত হয় তার লেখা 'আমাদের নবী', 'বাবা আদম', 'খোলাফায়ে রাশেদীন' প্রভৃতি গ্রন্থ। এসব গ্রন্থ মানুষের মনোভূমি সৃষ্টিতে বিশেষ করে শিশুদের মন-মানসিকতা গঠনে স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কবি মঈনুদ্দীনের সাহিত্যকর্মের অবদানের জন্য ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার, ১৯৭৮ সালে একুশে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

মানবদরদি কবি মঈনুদ্দীন তার সকল ভাবনা, সকল চিন্তা ও সাহিত্যকর্মের অবসান ঘটিয়ে ১৯৮১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই সুন্দর মায়াময় পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কবি সুফিয়া কামাল তাঁর সহযাত্রী কবি মঈনুদ্দীনের বিয়োগ-ব্যথায় লিখেছেন–

দরদী হৃদয় আর মায়াভরা মন,
সর্বক্ষণ হিত লাগি ছিল সর্বক্ষণ।
সকণ্ঠে স্নেহ-রসে সিক্ত, মানুষের লাগি,
রচিয়াছে কাব্য তাঁর, বহু রাত্রি জাগি।

কবি মঈনুদ্দীন আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেলেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস আমাদের হৃদয়ে সাড়া দিয়ে যায়। তার অমর সৃষ্টির মাঝে তিনি আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালান জমার পদ্ধতি

ট্রেজারি চালানের অর্থ জমা প্রদানের প্রচলিত পদ্ধতি সহজীকরণ, গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস, ভুয়া চালাল জমা ও রাজস্ব ফাঁকির প্রবণতা রোধসহ সঠিক সময়ে চালানের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করার জন্য 'স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি' উদ্‌বোধন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে-কোনো শাখায় ট্রেজারি চালানের অর্থ জমা নেওয়া যাবে। বর্তমানে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯টি শাখায় এবং সোনালী ব্যাংকের ১ হাজার ২২৪টি শাখায় ট্রেজারি চালানের অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অর্থবিভাগের বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেনদেনিং' পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু এনাবল সার্ভিস ডেলিভারি' (এসপিএফএমএস) প্রোগ্রামের অধীনে 'ইমপ্রুভমেন্ট অব BACS অ্যান্ড iBAS++ স্কিম'-এর আওতায় উদ্ভাবিত 'স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি' (Automated Challan System) ৮ই অক্টোবর Zoom Platform-এ যৌথভাবে উদ্‌বোধন করেন সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম এবং অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার।

এছাড়া স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতিতে ব্যাংক শাখার কাউন্টার নগদ, চেক ও অ্যাকাউন্ট ডেবিট-এর মাধ্যমে অর্থ জমাসহ গ্রাহক অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের মাধ্যমেও চালানের অর্থ জমা দিতে পারবেন। নগদ, অনলাইন ব্যাংকিং বা এমএফএস-এর মাধ্যমে অর্থ জমা দেওয়া হলে গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে চালানের কপি দেওয়া হবে, চেকের ক্ষেত্রে গ্রাহক চেক জমা স্লিপ পাবেন এবং পরবর্তীতে চেক ক্লিয়ার হলে গ্রাহককে পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চালান দেওয়া হবে। চেক গ্রহণ এবং চালান ইস্যু প্রতিটি স্তরেই গ্রাহক তার মোবাইলে মেসেজ পাবেন।

স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি সারা দেশে ৩ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। ১ম পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর সোনালী ব্যাংকসহ ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক–রূপালী, অগ্রণী, জনতা ব্যাংকের সকল শাখায়, ২য় পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল শাখায়, ৩য় পর্যায়ে সারা দেশে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল শাখায় বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হবে। রাজস্ব জমা প্রদান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। 'স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি'-এর মাধ্যমে প্রতিটি চালানের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংক হিসাবরক্ষণ, অফিস ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন– জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মধ্যে সংগতিসাধনের ফলে সরকারের রাজস্ব জমা বাড়বে। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের প্রদত্ত হিসাবের মধ্যকার পার্থক্য দূর হবে। সরকারি প্রাপ্তি সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সরকারের আর্থিক অবস্থান (Fiscal Position) ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: অনিক রহমান

করোনাকালে ডায়াবেটিসে করণীয়

মো. খালেদ হাসান

করোনা পরিস্থিতিতে নাজেহাল পুরো বিশ্ব। এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রত্যেক দেশ যার যার অবস্থান থেকে নিয়েছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। নিয়মিত চলছে লকডাউন এবং স্বাস্থ্য বিধি-নিষেধ। তবে এ সময় সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছেন ডায়াবেটিস রোগীরা। তাদের বলা হয় কো-মরবিডিটি। রক্তে চিনি বা শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এতে শুধু করোনা নয়, যে-কোনো ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায় এ রোগীদের। এছাড়া অনিয়মিত ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ওষুধের কার্যকারিতাও কমে যায়। করোনা সংক্রমণে ৮০ শতাংশই মৃদু বা মাইল্ড ধরনের, যা এমনিতেই সেরে যায়। ১৫ শতাংশ তীব্র বা সিভিয়ার ধরনের হতে পারে, যেখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। আর ৫ শতাংশ ক্রিটিক্যাল সেখানে ভেন্টিলেটর দরকার হতে পারে এমনকি রেসপিরেটরি ফেলিউর হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। চিকিৎসকরা বলছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীরা সহজেই আক্রান্ত হতে পারেন কোভিড ১৯-এ। আর আক্রান্ত হলে ডায়াবেটিস রোগীদের যেমন জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা থাকে তেমনি থাকে মৃত্যু ঝুঁকিও। এ অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত ওষুধ সেবন, বাড়তি যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি সুষম, প্রোটিন ও ভিটামিন সি জাতীয় খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার না হলেও, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি তাদের কাছে পরাস্ত হয় ভাইরাসটি। আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার ফলে প্রবীণ ও ডায়াবেটিস রোগীরা থাকেন সহজেই আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে। ডায়াবেটিসের কারণে শরীরে ইনসুলিন কমে যাওয়ায় তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। নিয়মিত চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবনের মাধ্যমে শরীরের শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ল্যাবএইড হাসপাতালের ডায়াবেটিস ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রণব চৌধুরী। কারণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হার্ট থেকে শুরু করে কিডনি, চোখ, ত্বক, শিরা-ধমনীতে বাড়বে সংক্রমণের আশঙ্কাও। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে সারা পৃথিবীতে ২৩ কোটি ২০ লাখ ডায়াবেটিস রোগী রয়েছেন। সেই হিসেবে যত্নের মান না বাড়লে ২০৩০-এ এর সংখ্যা হবে, ৩৬ কোটি ৬০ লাখ।

করোনায় আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগীদের করণীয়

১. আতঙ্কিত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া যাবে না। সবসময় হাসিখুশি থাকা।
২. জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত ব্যক্তিগত চিকিৎসক অথবা সরকারের নির্দেশিত করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করা।
৩. রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা অর্থাৎ ৭ মিলিমোলের নিচে রাখা, প্রয়োজনে ইনসুলিন বা ওষুধ সেবন অথবা উভয় চিকিৎসা সেবা চালু রাখা।
৪. করোনা উপসর্গ দেখা দিলে, নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে আলাদা রাখা। শরীর বেশি খারাপ না হলে হাসপাতালে না যাওয়া।
৫. ডায়াবেটিস রোগীদের ঘরে থাকা এবং অন্যের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।
৬. ঘরের ভেতরে, বারান্দায় হাঁটাচলা এবং হালকা ব্যায়াম করা।
৭. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে একটু পরপর হাত ধোয়া।
৮. অপরিষ্কার হাতে নাক-মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা। হাঁচি-কাশিতে রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করা এবং তা নির্দিষ্টস্থানে ফেলা।
৯. গলা শুকনো না রেখে তরল পানীয়, ফলের জুস, সুপ, লেবু পানি ও অন্যান্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা।
১০. ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিয়ে ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা।
১১. ঠান্ডা পানি, আইসক্রিম, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস পরিহার করা।
১২. ধূমপান, ক্রনিক অ্যালকোহলিক সম্পূর্ণ বর্জন করা।
১৩. বাইরের খাবার পরিহার করা।

ডায়াবেটিস রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়; তবে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই আমাদের এই মহামারি করোনাকালে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখি এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করি।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

সরকারি জমি রক্ষায় বৃক্ষরোপণ

বেদখল হওয়া সরকারি জমি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে প্রশাসন। সেই জমি নিয়মিত তদারকির পর আবার যাতে বেদখল না হয়ে যায় সেজন্য চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসন সরকারি জমি রক্ষায় ভিন্নধর্মী এক উদ্যোগ নিয়েছে। স্থান ভেদে কোথাও বৃক্ষরোপণ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, সড়ক, নালা-নর্দমা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় সড়ক ও জনপথ এবং সরকারি খাস জমি উদ্ধারকৃত এই জমিতে প্রায় ৭ হাজার ফলদ , বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। মনাই ত্রিপুরা পাড়ায় লাগানো হয় এক হাজার তালের চারা। নির্মাণ করা হয়েছে ৩টি পাবলিক টয়লেট। সম্প্রসারিত হয়েছে সড়কগুলো। এতে পরিবেশ সবুজায়ন, পথচারী ও যাত্রীদের সুবিধা ও যানজট নিরসনসহ নানাবিধ সুফল আসছে। সরকারি জমি রক্ষায় এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা।

প্রতিবেদন: রায়হান সাইফুর চৌধুরী

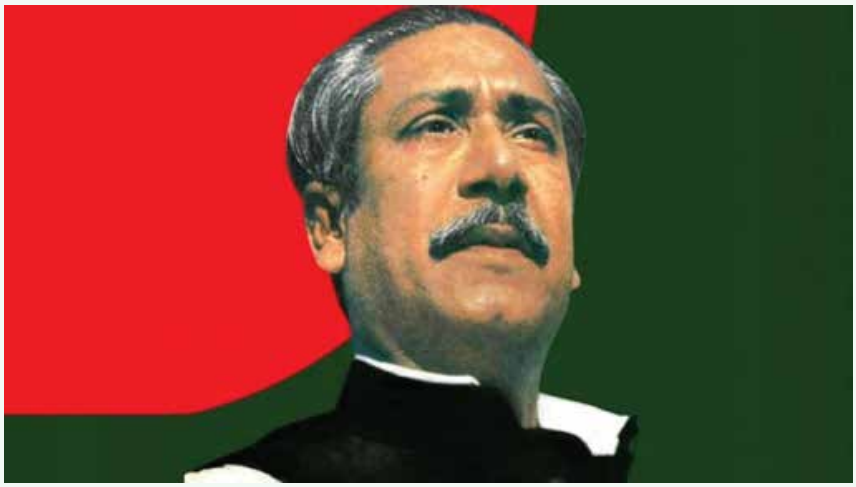

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা

কে সি বি তপু

শোকাবহ পনেরোই আগস্টের পর তেসরা নভেম্বর বাঙালি জাতির জন্য গভীর শোক ও বেদনার দিন। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে সেনাবাহিনীর বিপথগামী একটি দলের বর্বর ও নৃশংস আক্রমণে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে শহিদ হন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের নেতৃত্বে নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহচর, বাঙালির দুঃসময়ের কাণ্ডারি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপটেন এম মনসুর আলীকে। যে কারাগারকে নিরাপদ জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেই কারাগারেই গর্জে ওঠে ঘাতকের রাইফেল আর নিমিষেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এই জাতীয় চার নেতা। এই জাতীয় চার নেতা আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আপোশ নয়, সমঝোতা নয়, কাপুরুষতা নয়, হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আদর্শের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এই জাতীয় চার নেতাও বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাগ্রত, অম্লান ও ভাস্বর হয়ে আছেন। বাঙালি জাতির পিতার পাশাপাশি এই চারটি মুখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আমাদের মানসলোকে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপটেন এম মনসুর আলী– এই চার জাতীয় নেতা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিটি আন্দোলন, গণ-আন্দোলন, সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিশ্বস্ত এই জাতীয় চার নেতাকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন, যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরা আন্দোলন, সংগ্রাম এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালিত করতে পারেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায়। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের বিষয়টি মূলত এই জাতীয় চার নেতার ওপর বর্তায়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদসহ জাতীয় চার নেতার গভীর সম্পর্কের কারণে সরকার গঠন, পরিচালনা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনার ইঙ্গিত তাঁরা পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

১০ই এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় এবং যার ওপর ভিত্তি করে ঐদিনই মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের এক বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করার মাধ্যমে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণাপূর্বক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতঃপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে একটি বৈধ সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ পূর্বনির্ধারিত স্থান মেহেরপুর মহকুমার বৃক্ষরাজি শোভিত ছায়াসুনিবিড় বৈদ্যনাথতলা গ্রামে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রিসভার শপথ পাঠ করান। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন এম মনসুর আলী (অর্থমন্ত্রী), এ এইচ এম কামারুজ্জামানসহ (স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী) অন্যান্য সদস্য। এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে শপথ গ্রহণ শেষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন 'মুজিবনগর'। এই মুজিবনগর সরকারই অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশের বিজয় ছিনিয়ে আনে।

জাতীয় চার নেতা ছিলেন যেমন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত, তেমনি ছিলেন প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অধিকারী। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁরা যে মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ছিল অভূতপূর্ব।

স্বাধীনতার পরে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে গড়ে তোলবার দৃঢ় প্রত্যয়ে যখন বঙ্গবন্ধু নিরলসভাবে কাজ করছিলেন, তখন জাতীয় চার নেতা ছায়ার মতো অনুসারী হয়ে দেশগড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ের ভাষণে আরো বলতেন, 'বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি'। ১৯৭২ সালের

১৯৭১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গভর্নর হাউসে (বঙ্গভবন) মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় চার নেতা

১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে।' প্রকৃতপক্ষে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে তাই ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধু রক্ত দিয়েই বাঙালির ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বের শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে প্রকারান্তরে এদেশের স্বাধীনতাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ও তেসরা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দুটি ঘটনাই একই গ্রন্থিতে বাঁধা। একাত্তরের অর্জনকে সমূলে বিনাশ করার জন্যই গভীর ষড়যন্ত্র করে এসব ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। পনেরোই আগস্ট ও তেসরা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড ছিল একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে বিলীন করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের আদলে পরিণত করার অপচেষ্টা। হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ছিল পরিকল্পিত।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে খুনিরা নিশ্চিত হতে পারেনি। তাদের ভয় ছিল জাতীয় চার নেতাসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনেক অনুসারীকে, যাঁরা খুনিদের ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আগস্ট মাসের ২২ তারিখে জাতীয় চার নেতাসহ আওয়ামী লীগের অনেক ত্যাগী নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে দেশে তাঁর যোগ্য রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা যেন জনগণকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করতে না পারে, এজন্য খুনিরা ঠান্ডা মাথায় ১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বর ঢাকার তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা অবস্থায় জাতীয় চার নেতাকে নৃশংস কায়দায় হত্যা করে। কারাগারের অভ্যন্তরে ঘাতকেরা রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে প্রবেশ করে ব্রাশফায়ারে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে।

বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর এই সংগ্রাম আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁরই নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাঁরই বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, যার ফলে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। বাঙালির ইতিহাসে তাঁদের কীর্তিগাথা চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকবে। জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এবং তাঁর আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বিশ্বাসঘাতকতা করেননি দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে। তাঁরা ইতিহাসে উজ্জ্বল আদর্শিক নক্ষত্র।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে পেছনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁদের নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো নানাভাবে। তাঁরা আপোশ করেননি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা। ঘাতকরা তাঁদেরকে হত্যা করেছে কিন্তু তাঁদেরকে বাঙালি জাতির হৃদয়ের আসন থেকে সরাতে পারেনি। তাঁরা অমর, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। তাঁদের আদর্শ ও নীতি তাঁদেরকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। তাঁদের মধ্যে স্বমহিমায় উজ্জ্বলতম তাঁদের প্রিয়তম নেতা বঙ্গবন্ধু। আমাদের বিশ্বাস– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতার চেতনা বাঙালির প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনন্তকাল প্রবাহিত হবে।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সাতই মার্চকে ঐতিহাসিক দিবস ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ দেওয়া ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ১৯শে অক্টোবর পরিপত্র জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। পরিপত্রে বলা হয়, সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের সাতই মার্চের প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ হিসেবে ঘোষণা এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন পালন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'ক' ক্রমিক অন্তর্ভুক্ত হলেও দিবসটির ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটি প্রযোজ্য হবে না। এতে আরো বলা হয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে তবে বিষয়ভিত্তিক বণ্টনের আওতায় প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে দিবস উদ্‌যাপনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত এবং দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সচেতনতা আগামী প্রজন্মের মধ্যে যথাযথভাবে সঞ্চালনের লক্ষ্যে ওই কর্মকাণ্ডে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করতে হবে।

এর আগে ৭ই অক্টোবর মন্ত্রিসভা ১৯৭১ সালের সাতই মার্চকে ঐতিহাসিক দিবস ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন দেয়।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব

সুস্মিতা চৌধুরী

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের দেশ বাংলাদেশ। ছয় ঋতুর মোড়কে মোড়া এই মাতৃভূমি। একেক ঋতু একেক রূপ নিয়ে হাজির হয় আমাদের মাঝে। রূপ-বৈচিত্র্যে তার তুলনা হয় না কারো সঙ্গে। ছয় ঋতুর এই মা-মাটি-বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন সাজসজ্জা। তাই কবি বলেছেন– 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'।

বাংলাদেশের ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত হলো চতুর্থ ঋতু– যা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুটি মাসের সমন্বয়ে গঠিত। এরপর আসে শীত, তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস।

হেমন্ত মানেই পাকা ধানের ঋতু। শিশির ভরা সকাল। নবান্নের গান। এ সময় গ্রামীণ জনপদে ভোর হলেই কুয়াশা নামে। কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দেয় জমিনের ওপর। ভিজিয়ে দেয় ঘাসের ডগা। পাতায় পাতায় পড়ে শিশির ফোঁটা। নরম ধানের পাতা ভিজে যায়। ভোরকে ভোর মনে হয় না। মনে হয় যেন দুপুর রাত। দখিনা বাতাসে হৃদয় মন ভরে ওঠে। শীতল বাতাসে মন আনমনা হয়ে যায়।

নবান্ন উৎসব মানে নতুন চাল বা অন্নের উৎসব। অনেক আগের কথা, তখন বাদশা আকবরের রাজত্ব, সে সময় পহেলা অগ্রহায়ণকে (মধ্য নভেম্বর) বাংলা নববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সময়ে প্রধান দুটি খাদ্যশস্য রোপণ করা হতো– একটি আউশ এবং অন্যটি আমন। বেশির ভাগ সময় হেমন্তকালে এই শস্যটি রোপণ করা হয় বলে অন্য কোনো শস্য উৎপাদন হতো না। তখন সমস্ত দেশ এই শস্যে ছেয়ে যেত। সে সময়ে আউশ বেশ জনপ্রিয় এবং ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন একটি শস্য ছিল। এদিক দিয়ে আমন চালের শস্য সারা বছরই কমবেশি উৎপাদন হতো বলে এই শস্যটি পাওয়া যেত সারা বছরই। অগ্রহায়ণের কিছুটা আগে মানে কার্তিক মাসে আউশ শস্যটি রোপণ করা হতো। যার ফলে হেমন্তকাল এসে পৌঁছাতেই শস্যের মাঠ হলুদে ছেয়ে থাকত। ধান পেকে মাঠ হলুদ হয়ে আছে এই দৃশ্যের চেয়ে সুখকর কোনো দৃশ্য পরিশ্রমী কৃষকরা দেখেনি। হলুদ মাঠ দেখে কৃষকদের মুখে ফুটে উঠত রাজ্যের হাসি। এ আনন্দ যেন থামবার নয়। তখনই ঐ সময়টাকে উৎসবে পরিণত করা হলো, নাম দেওয়া হয় 'নবান্ন উৎসব' মানে 'নতুন চাল বা অন্নের উৎসব'। এই সময় ধান কেটে শুকিয়ে সিদ্ধ করে তৈরি করা হয় নানা ধরনের পিঠাপুলি এবং খাবার। এসব পিঠাপুলি সবাই এক হয়ে উপভোগ করে এবং মিলেমিশে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করে।

আমাদের দেশে নতুন ধান কাটাও রীতিমতো উৎসবের ব্যাপার। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে কৃষকেরা দলবেঁধে নেমে পড়ে সোনালি মাঠে। গান গাইতে গাইতে ধান কাটে তারা। তারপর রাতেই গরু দিয়ে মাড়াই করা হয় সেই ধান। ভোর রাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাড়ির মা-বোনেরা। এরপর শুরু হয় ধান সিদ্ধ। সেই ধান রোদে শুকানো হয় বাড়ির উঠানেই। এরপর ঢেঁকিতে ধান ভানা। সে কী মধুর আওয়াজ। রাতে নতুন ধান পানিতে ভিজিয়ে খুব ভোরে শুরু হয় গুড়া করা । সঙ্গে মেলানো হয় গুড়, চিনি, দুধ। কখনো কখনো সঙ্গে দেওয়া হয় তাল-নারিকেলের ফোঁপরা,

কচি নারিকেলের লেই, ডাবের পানি, কিছমিছ।

বর্তমানে নবান্ন উৎসব নগর জীবনকেও নানাভাবে আন্দোলিত করে। এই উৎসব উপলক্ষে নানা জায়গায় পালিত হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিঠা-পায়েসের মেলা, বিভিন্ন কুটির ও বেতশিল্পের মেলা। এসব অনুষ্ঠান ব্যস্ত নগর জীবনে নিয়ে আসে এক অনাবিল আনন্দের ছোঁয়া।

হেমন্তের নবান্ন উৎসব আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান এবং অংশ। ঘরে ধান থাকলে কিষান-কিষানির কোনো দুঃখ থাকে না। তাই ঘরে ঘরে জামাই-স্বজনকে ডাকা এবং পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা, গাজীর গীত, লাঠিখেলা, বাউলগান এবং কোনো কোনো জায়গায় গ্রাম্যমেলার আয়োজন হয়ে থাকে। এসময় কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার আয়োজন উৎসবে পরিণত হয়। ঋতুকন্যা হেমন্ত উৎসবে আপন বৈভব ছড়ায় লোকজ সংস্কৃতিতে।

বাংলার প্রত্যেকটি ঋতুর আছে নিজস্ব বৈচিত্র্যতা ও সৌন্দর্যতা। হেমন্তের রয়েছে সোনালি প্রকৃতি এবং নবান্ন উৎসব। কনকনে হিম বাতাস, সোনালি প্রান্তর সব মিলিয়ে মানুষকে উৎফুল্লিত করে। তাই হেমন্ত ঋতু বাঙালির জীবনে বয়ে আনে এক অনাবিল আনন্দ ও বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

কাঠঠোকরা

একদিন শেরপুর শহরে তৃতীয় তলায় একটি ফ্ল্যাটে সকালে আমি ঘুমে মগ্ন। জানালার থাইগ্লাসে খচ্ খচ্ খচ্ খচ্, ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ। একটু থেমেই সজোরে ঠক্ ঠক্ ঠক্। এত আওয়াজ, ভেঙে গেল ঘুম। ভাবতে লাগলাম– এ রকম ডিস্টার্ব কে করছে? শব্দ যেন থেমে নেই। অসহ্য হয়ে আস্তে আস্তে উঠে জানালার পর্দা ফাঁকা করে দেখার চেষ্টা করলাম। এক অদ্ভুত দৃশ্য! দেখে অবাক হয়ে গেলাম। খুব সুন্দর একটি পাখি।

পাখিটির পিঠে বসন্তের হলুদ পালক, বুকে বাংলার মাটির ধূসর রং, মাথায় লাল টোপর। ঘুম থেকে উঠার জন্য পাখিটি যেন বারবার আহ্বান করছিল। একবার মনের আনন্দে লাফিয়ে জানালার উপরে উঠছে, আবার নামছে। দৃশ্যটি একেবারে এক হাত দূর থেকে দেখা। মনে হয় ইচ্ছে করলেই পাখিটি ধরা যাবে। কিন্তু সে কি সম্ভব! পাখিটির নাম কাঠঠোকরা। আমাদের দেশীয় পাখির মধ্যে একটি। যা গ্রামগঞ্জে সচরাচর দেখা যায়।

প্রতিবেদন: মো. মঈন উদ্দিন

বঙ্গবন্ধু এবং সমবায়

নাজমুন নাহার

সকল সমবায়ীদের একটি পতাকাতলে এনে তাদের উৎসাহ প্রদান, উন্নয়নের ধারায় সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মহান ব্রত নিয়ে প্রতিবছর আমাদের দেশে নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার পালিত হয় 'জাতীয় সমবায় দিবস'। ১৯৭২ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে দিবসটি। বাংলাদেশের তাবৎ সমবায়ীদের কাছে দিবসটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধুর সমবায় বাংলার-ই প্রতিচ্ছবি। তাইতো স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক দর্শনের ভিত্তি ছিল– আপামর জনমানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। উন্নয়ন দর্শনে তাই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন সমবায়কে। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। গ্রামে গ্রামে গণমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রাম্য অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন বাংলার মেহনতি জনগণ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে গভীর আবেগে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এজন্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।' ইতিহাসের মহানায়কের এ কালজয়ী ভাষণ কেবল কোনো আবেগতাড়িত অভিব্যক্তি নয়; এটি তাঁর আজন্মলালিত এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শনও বটে। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, সমবায় একটি আন্দোলন ও চেতনার নাম, একটি আদর্শ ও সংগ্রামের নাম। ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হলেও সমবায় সমিতি কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়। সমিতিতে শেয়ার ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা সমবায়ীদের প্রধান লক্ষ্য নয়। সাতটি মৌলিক নীতিমালার ওপর নির্ভর করে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ, উন্মুক্ত সদস্য হওয়ার সুযোগ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময় এবং সমাজকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতেন।

সমবায় হলো গণতন্ত্রের পথ। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ওই ধরনের ভুয়া সমবায় কোনো মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে, সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়– মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমরা পুরনো ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক-মজুর-জেলে-তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।' দেশের এবং জনগণের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর দায়বদ্ধতার কথা এখানে সুস্পষ্ট। দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

কৃষিতে সমবায় ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের আর্থসামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায়

তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব না। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে আগাতে পারলে আমাদের কৃষির উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন দুটিই মাত্রা পাবে, সমৃদ্ধ হবে।'

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত করতে হবে। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বণ্টন ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১লা মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন, 'সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যে বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই নভেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে 'সমবায়ের সাফল্যগাথা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না। আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে।'

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর জাতির পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সারা দেশে সমবায়ভিত্তিক নানান কার্যক্রম চালু হয়। গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং গভীর নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। পাশাপাশি তাঁর উৎসাহে জেলে, তাঁতি প্রভৃতি পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের নতুন যাত্রাপথ তৈরি হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলেই সমস্ত বড়ো শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করা হয়। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দেন তিনি। সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল, ভোগের ন্যায্য অধিকার। তিনি ১৯৭৩ সালে মিল্ক ভিটার মতো সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে যে জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছে সেখানে কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরো উল্লেখ করা হয়, মৎস্য, দুগ্ধ ও সেবা খাতের মতো ফসল উপখাতেও সমবায় কার্যক্রম চালু করার সুযোগ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেখে দেশের আপামর জনসাধারণ আশ্বস্ত হতে পারছেন এই ভেবে যে, তিনিও বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। একের পর এক জনকল্যাণমুখী সাফল্যে আমরা এগিয়ে চলেছি তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সমবায়ভিত্তিক আশ্রয়ণ প্রকল্প, সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সমবায়ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দিয়ে এ দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন তিনি। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প যদিও সমবায়ভিত্তিক নয়; কিন্তু সমবায়ের ধারণার আলোকেই করা হয়েছে, যা এ দেশের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে পাথেয় করে ইতিবাচক মানসিকতায় ঋদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বহুবিধ সমবায়বান্ধব কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে আসুন, আমরা সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা। ৪৯তম সমবায় দিবসে আসুন আমরা সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই।

লেখক: প্রাবন্ধিক

কিশোরগঞ্জে হাওরের বুকে দৃষ্টিনন্দন পিচঢালা পথ

রেজুয়ান খান

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলার জনজীবনে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। বর্ষা মৌসুমে চারদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি বেষ্টিত হাওর। শুষ্ক মৌসুমে শুধু ফসলি জমি আর মেঠোপথ। হাওরবাসীর মুখের প্রবাদ– বর্ষাকালে নাও, শুকনাকালে পাও। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এ জনপদেই জন্মেছেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর কাটিয়েছেন এখানে। উপমহাদেশের বাঙালি প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, আনন্দ মোহন বসু, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের মতো গুণী মানুষের জন্ম এ হাওর অঞ্চলে। এছাড়া এই হাওরের তীরেই জন্ম নিয়েছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায় ও তাঁর বাবা ছড়াকার সুকুমার রায়।

বর্ষাকালে নৌকায় চড়লে দুচোখের দৃষ্টি যত দূর যায়, পুরোটাই অথৈ পানি, আর পানি যেন কূলহীন সাগর। কিশোরগঞ্জ হাওরবাসীর সহজ ও দ্রুততর যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেই রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২০১৬ সালের ২১শে এপ্রিল ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রামে ২৯.৭৩ কিমি. অলওয়েদার সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই অক্টোবর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৯.৭৩ কিমি. সড়কটি উদ্‌বোধনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। পিচঢালা এ সড়কটি ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলাকে সংযোগ করেছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২২শে জুন ২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৩১.২১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে– ২৯ কিমি. ফ্লেক্সিবল সড়ক নির্মাণ, ৬২টি কালভার্ট নির্মাণ, ১১টি আরসিসি সেতু নির্মাণ, ৩টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ এবং ৭ দশমিক ৬ লক্ষ বর্গমিটার সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষা কাজ।

এরমধ্যে ২৬১.৮১ মিটার দীর্ঘ ভাতশালা সেতু, ১৭১.৯৬৪ মিটার ঢাকী সেতু ও ১৫৬.৭২ মিটার দীর্ঘ ছিলনী সেতু সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্ষায় ভাঙন থেকে সড়ক রক্ষায় ৭.৬০ লাখ বর্গমিটার সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রটেকশনের কাজ করা হয়েছে।

হাওরবাসীর স্বপ্নের হাওরের বুক চিরে গড়ে তোলা দৃষ্টিনন্দন এই রাস্তার কল্যাণে পর্যটক আকর্ষণের নতুন সম্ভাবনা হাতছানি দিচ্ছে। বিশাল জলরাশির মাঝ দিয়ে দিগন্তজোড়া দৃষ্টিনন্দন সড়ক যেন মেলে ধরেছে শিল্পীর তুলিতে আঁকা চিত্রকর্ম। এই সড়কে ভ্রমণবিলাসে মেতেছেন পর্যটকরা। অলওয়েদার সড়কটি পর্যটকদের কাছে ভ্রমণ বিলাসের উপকরণ মনে হলেও স্থানীয়দের জন্য এটা আশীর্বাদ।

অপার সৌন্দর্যময় এ সড়কের দিক নির্দেশনা স্তম্ভগুলো সড়কের গন্তব্যের সঠিক গতিপথকে নির্দেশ করে দেয়। জলে ভাসা উঁচু পাকা সড়কের সরল পথগুলো এসে তিন সড়কের একমাথায় মিলিত হয়েছে। যার এক দিকে ইটনা, অন্যদিকে মিঠামইন আর অন্য আরেক প্রান্ত কোণ দিয়ে অষ্টগ্রামের রাস্তা।

দুপাশে পানির ছলছল শব্দ, উত্তাল ঢেউ আর এলোমেলো বাতাসে খানিকটা এগুলেই মিলবে নৈসর্গিক তৃপ্তি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা পেয়ে এখন নতুন স্বপ্নে বিভোর হাওরবাসী।

প্রাকৃতিকভাবেই হাওরের সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। বিচ্ছিন্ন এসব এলাকার মানুষ এখন ছুটছেন পাকা রাস্তা ধরেই সচ্ছলতার গন্তব্যে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম অলওয়েদার সড়কটি কিশোরগঞ্জ হাওর অধ্যুষিত এলাকাবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণিকুল

পুলক আহমেদ

প্রাণীরা পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। প্রতিটি প্রাণী তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক প্রাণী জীবনযুদ্ধ করে প্রাণী ও খাদ্যশৃঙ্খল রক্ষা করছে। জীববৈচিত্র্যের একাংশ জুড়ে রয়েছে প্রাণিকুল। প্রাণীর অধিকার রক্ষা ও কল্যাণার্থে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৪ঠা অক্টোবর পালিত হয় 'বিশ্ব প্রাণী দিবস'। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে– পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রাণিজগতের কল্যাণের জন্য বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রাণী কল্যাণ আন্দোলনকে যূথবদ্ধ করা।

হেনরিক জিম্মারমেন নামের একজন জার্মান লেখক ১৯২৫ সালের ২৪শে মার্চ জার্মানির বার্লিন প্যালেসে প্রথম এই দিবস উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠানে সাড়ে চার হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী ছিল। এরপর ১৯৩১ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে 'আন্তর্জাতিক প্রাণী সুরক্ষা কংগ্রেস'-এ তার উপস্থাপন করা প্রস্তাব মতে ৪ঠা অক্টোবরকে 'বিশ্ব প্রাণী দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দিবসটি বাংলাদেশেও পালিত হয়।

সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবী এগিয়ে চলেছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্য দিয়ে। মূলত উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভর করেই প্রাণিজগতের বেঁচে থাকা। এই নির্ভরতা কোথাও খাদ্যের প্রয়োজনে, কোথাও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, কখনোবা জীবনধারণের তাগিদে। এই শৃঙ্খলকে পারিভাষিক শব্দে বলা হয় বাস্তুসংস্থান। এই বাস্তুসংস্থানে ফাটল ধরিয়েছে একটি মাত্র প্রাণী। তার নাম মানুষ। মানুষ তার বুদ্ধি ও প্রযুক্তির শক্তিতে হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অধীশ্বর। নিজের প্রয়োজনে অন্য প্রাণকে সে ব্যবহার করছে অবাধে। মানুষের আগ্রাসী লোভের মুখে পৃথিবীর উদ্ভিদ রাজ্য প্রায় নিঃশেষিত। অনেক প্রাণীই আজ লুপ্ত, অনেক প্রজাতির প্রাণীর সামনে ঝুলছে অবলুপ্তির ইশারা। এই পরিস্থিতিতে কিছু বিজ্ঞানী ও দূরদর্শী মানুষ উপলব্ধি করলেন যে, এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীতে যে প্রাণ বৈচিত্র্য আছে তা হয়ে যাবে নিঃশেষ এবং পৃথিবী হয়ে উঠবে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও কবর ভূমি। এই বোধ থেকেই সংরক্ষণের সূচনা।

২৮২টি পণ্যকে বহুমুখী পাটজাত পণ্য ঘোষণা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় এবং পাট শিল্পের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্যকে বহুমুখী পাটজাত পণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। ১১ই অক্টোবর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বহুমুখী পাটজাত পণ্যের নামসহ একটি তালিকা প্রকাশ করে।

পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০, পাট আইন ২০১৭, জাতীয় পাটনীতি ২০১৮ প্রণয়ন করেছে সরকার। সব আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যের প্রায় ৭০০ জন উদ্যোক্তা বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছে, যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন : মো. রোমান

এবারের ২০২০ সালের ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে-এর মূল ভাবনা বা থিম হলো–'সাসটেইনিং অল লাইফ অন আর্থ' অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্যের মূল উপাদান হিসেবে সমস্ত বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে পৃথিবীর সমস্ত জীবন বাঁচিয়ে রাখা।

'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪' বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত প্রথম আইন। ১৯৭৩ সালের ২৭শে মার্চ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশক্রমে 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩' জারি করা হয়। আদেশটি প্রেসিডেন্ট আদেশ ২৩ নামে পরিচিত। এটি ১৭ই জুলাই প্রথম দফায় সংশোধন করা হয়। প্রেসিডেন্ট আদেশ ২৩ এরপর একই বছর আগস্ট মাসে জাতীয় সংসদে যায়। পরের বছর ১৯৭৪ সালে আদেশটি দ্বিতীয় দফায় সংশোধিত হয় এবং বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ হিসেবে অনুমোদিত হয়। মূল আইনটি ইংরেজি ভাষায় রচিত। এ থেকেই বোঝা যায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কতটা আন্তরিক ছিলেন।

এককোষী থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির বহুকোষী প্রাণী পৃথিবীতে বিদ্যমান। প্রাণীরা সাধারণত জীবনধারণ করার জন্য অন্য জীবের ওপর নির্ভর হয়ে থাকে। কখনো তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আবার কখনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত 'ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমেল অ্যাক্ট ১৯২০'-এ বলা হয়েছে, 'যদি কেউ পশুকে দিয়ে ক্ষমতার চেয়ে বেশি ভার বহন করায়, বিনা কারণে কোনো পশুর প্রতি নির্দয় আচরণ করে, প্রহার করে অথবা এমনভাবে বেঁধে রাখে বা বহন করে, যাতে নির্দয় আচরণ স্পষ্ট হয় অথবা নির্দয় আচরণের কারণে কোনো পশুর মৃত্যু হয়, তাহলে এর জন্য দায়ী ব্যক্তির সর্বোচ্চ তিন মাসের জেল এবং ১০০ টাকা জরিমানা হতে পারে'।

সরকার ইতোমধ্যে বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ পাস অন্যতম। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, বাঘ ও হাতি হত্যা করলে সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা ১০ লাখ টাকা। আরো ১২ ধরনের প্রাণী হত্যার জন্য তিন বছরের জেল এবং তিন লাখ টাকা জরিমানার বিধান আছে। এই আইনে ১,০৩৭টি প্রাণী এবং উদ্ভিদকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনের কথা বলে আসছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগঠিতভাবে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্যে গড়ে উঠেছে নানা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা; যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাউন্ডেশন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সংরক্ষণ আন্দোলন। এছাড়া ২০১৯ সালের প্রাণী কল্যাণ আইনের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মালিক ব্যতীত কোনো প্রাণী হত্যা বা অপসারণ করা যাবে না। আমাদের যদি পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হয় তবে নিজেদের প্রয়োজনেই আমাদের প্রাণিকুলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মানবসভ্যতা আধুনিকতার যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখানে বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রাণিকুলের প্রতি দায়িত্বহীনতাই যে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে সেই হুঁশিয়ারিও বিগত কয়েক বছর ধরে দিয়ে আসছেন পরিবেশবিদরা। গবেষণায় উঠে এসেছে, বিগত ৪০ বছরে পাখি, মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, উভচর এবং সরীসৃপ সবমিলিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০% প্রাণী হ্রাস পেয়েছে। জীববৈচিত্র্য হ্রাস একটি গ্রহের সংকট, যার সমাধান করতে হবে। কারণ বন বাঁচলে বাঁচবে প্রাণী, বাঁচবে মানুষ ও প্রকৃতি। মনে রাখতে হবে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বন ও বন্যপ্রাণী, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গকে পর্যন্ত রক্ষা করতে হবে। কারণ পৃথিবীর এই সব প্রাণীকে নিয়েই বয়ে চলেছে প্রাণের নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে, মানুষের অস্তিত্বও একদিন চরম বিপন্ন হয়ে উঠবে। তাই আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা নিশ্চিত করতে হবে। এটাই এখন সময়ের দাবি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে বিস্ময় প্রকাশ ভারতের গণমাধ্যমে

চলতি ২০২০ সাল শেষে মাথাপিছু জিডিপি'তে ভারতকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ। এশিয়ায় বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, মাথাপিছু জিডিপি সংকুচিত হবার অন্যতম কারণ মহামারি কোভিড, লকডাউন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জিডিপি বিষয়ক পূর্বাভাস জানানোর ফলে ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশকে প্রশংসা করে। শুধু গণমাধ্যমই নয়, ভারতের অন্যতম বড়ো রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীও এক টুইট বার্তায় বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রার প্রশংসা করেছেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা *দৈনিক আনন্দবাজার* পত্রিকা বাংলাদেশের অগ্রগতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। অপর বাংলা পত্রিকা *দৈনিক সময়*, *এই সময়* ও *বর্তমান* প্রথম পাতায় লিখেছে যে– 'আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে ভারতকে পেছনে ফেলবে বাংলাদেশ'। একই ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া *এনডিটিভিতে*। চ্যানেলটি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উচ্চ ধারার জিডিপি'র প্রশংসা করেছে। *এবেলা*, *সংবাদ প্রতিদিন*, *দ্য এশিয়ান এইজ*, *দ্য টেলিগ্রাফ* পত্রিকা এই খবরটি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে। আইএমএফ-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউট লুকেও (ডব্লিউইও) বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে ভারতের মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন দাঁড়াবে ১ হাজার ৮৭৭ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকার কিছু বেশি। সেখানে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন হবে ১ হাজার ৮৮৮ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা।

প্রতিবেদন: সিমরান কাজী

ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় এগিয়েছে বাংলাদেশ

সৈকত নন্দী সৌখিন

ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় গত বছরের চেয়ে আরো এগিয়েছে বাংলাদেশ। ১৬ই অক্টোবর প্রকাশিত এই সূচক বলছে, গত বছরের চেয়ে ১৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফে যৌথভাবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের (জিএইচআই) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম। গত বছর একই সূচকে ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৮। তবে সে বছর কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। এই সূচকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ছিল ৮৬তম।

জিএইচআইয়ের তথ্য মতে, ক্ষুধা মেটানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ভারতের এবারের অবস্থান ৯৪তম ও পাকিস্তানের ৮৮তম। গত বছরও ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। গত বছরের সূচকে ভারত ১০২তম ও পাকিস্তান ৯৪তম অবস্থানে ছিল।

সূচকে মোট ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের এবারের স্কোর ২০ দশমিক ৪। ২০০০ সালে এই সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩৪ দশমিক ১। অর্থাৎ গত ২০ বছরের কম সময়ে ক্ষুধা নিবারণে জাতীয় পর্যায়ে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশের। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে শূন্য পেলে বুঝতে হবে, ওই অঞ্চলে ক্ষুধা নেই। আর এই সূচকে ১০০ পেলে তা ক্ষুধার সর্বোচ্চ মাত্রা বোঝাবে।

এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'আমরা সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। এখন সেই খাদ্য যাতে পুষ্টিকর হয়, সে জন্য কাজ করছি। পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে।'

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের মাধ্যমে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অপুষ্টির মাত্রা, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতা এবং শিশুমৃত্যুর হার হিসাব করে ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বৈশ্বিক, আঞ্চলিক বা জাতীয় যে-কোনো পর্যায়ে ক্ষুধার মাত্রা নির্ণয় করতে এই সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিশ্ব ক্ষুধাসূচকের এবারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ১৭টি দেশের স্কোর ৫-এর কম। অর্থাৎ এসব দেশে ক্ষুধার মাত্রা সবচেয়ে কম। এসব দেশের মধ্যে আছে বেলারুশ, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, চিলি, চীন, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, কিউবা, এস্তোনিয়া, কুয়েত, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মন্টেনিগ্রো, রোমানিয়া, তুরস্ক, ইউক্রেন ও উরুগুয়ে।

এই সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের মধ্যে দক্ষিণ সাহারা ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সর্বোচ্চ মাত্রা বিরাজ করছে। এছাড়া বিশ্বের তিনটি দেশে ক্ষুধার মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে আছে। এগুলো হলো– চাদ, পূর্ব তিমুর ও মাদাগাস্কার। এই সূচকে অস্থায়ীভাবে আরো আটটি দেশে ক্ষুধার মাত্রা উদ্বেগজনক হতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশগুলো হলো– বুরুন্ডি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কোমোরোস, কঙ্গো, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান ও ইয়েমেন।

বিশ্ব ক্ষুধাসূচক মতে, বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার মাত্রা এখন সহনীয় পর্যায়ে আছে। তবে পৃথিবীর সব অঞ্চলে তা সমান নয়। বিশেষ বিশেষ দেশ, অঞ্চল বা সম্প্রদায়ে ক্ষুধার মাত্রা মারাত্মক পর্যায়ে আছে। ক্ষুধার মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা টেকসই উন্নয়নের দ্বিতীয় লক্ষ্যমাত্রা।

বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার শিল্পায়নের পাশাপাশি কৃষিতে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য, মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান চতুর্থ এবং মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। কৃষি উপকরণের দাম কয়েক দফা হ্রাস করা হয়েছে। কৃষিতে আধুনিকায়ন এবং নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করায় ধান উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে উঠতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লাখ মেট্রিক টন। ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা ডিএপি সারের দাম কৃষক পর্যায়ে কমানো হয়েছে। ভরতুকি মূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হচ্ছে।

আমাদের প্রত্যাশা হলো– সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতায় আরো এগিয়ে যাবে এ দেশ। ক্ষুধামুক্ত হোক সব জনগণ। বাংলাদেশে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ হয়ে উঠুক আরো উন্নত ও সমৃদ্ধশালী।

লেখক: ব্যাংকার ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের ধনিয়া যাচ্ছে মহাকাশে

বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সুখবর নিয়ে এসেছে ধনিয়া বীজ। ইতিহাসে এই প্রথম দেশের ধনিয়া বীজ যাচ্ছে মহাকাশে। সেখানে গবেষণায় এই বীজ ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশ থেকে এই ধনিয়া বীজ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় জাপান হয়ে স্পেস কার্গো বিমানে করে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) কানেকশন সায়েন্সের প্রধান প্রকৌশলী গণমাধ্যমকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে।

এই বীজের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন নভোচারীরা। বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও ধনিয়া বীজ যাচ্ছে মহাকাশে, থাকছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করা বীজও। ২০২১ সালের জুন মাসে এই ধনিয়া বীজগুলো পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। এভাবেই আন্তর্জাতিক মানের একটি দীর্ঘ গবেষণার অংশ হয়ে উঠল বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: আলেয়া বেগম

শব্দের জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ

আমব্রিন আজওয়া

হুমায়ূন আহমেদ– বাংলা সাহিত্য অঙ্গনের এক কালজয়ী নক্ষত্রের নাম। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের কথাসাহিত্যে যে কজন শক্তিমান লেখক তাঁদের লেখা দিয়ে এই পরিমণ্ডলকে বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন, হুমায়ূন আহমেদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ নাম। তিনি দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর বাংলার পাঠকসমাজকে নিজের কলমের জাদুতে একরকম মোহবিষ্ট করে রেখেছিলেন। যখন যেখানে কলম চালিয়েছেন, নিজের সোনালি হাতের স্পর্শ দিয়েছেন, সেটাই বাংলার মানুষ গ্রহণ করেছে পরম মমতায়, পরম ভালোবাসায়।

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার মোহনগঞ্জে তাঁর মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ। তাঁর পিতা একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার উপ-বিভাগীয় পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় শহিদ হন। হুমায়ূন আহমেদের অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেশের একজন শিক্ষাবিদ এবং কথাসাহিত্যিক; সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবীব রম্য সাহিত্যিক এবং কার্টুনিস্ট।

হুমায়ূন আহমেদকে বলা হয় বর্তমান কথাসাহিত্যের রাজপুত্র। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ এক বিস্ময়কর নাম, এক জাদুমাখা নাম। তিনি জানেন কীভাবে গল্প লিখতে হয়, গল্পকে গল্প করে তুলতে হয়। এই দুরূহ একইসঙ্গে কঠিন কাজটি করে তিনি অনন্য মেধার সাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে বাংলা ছোটোগল্পে তিনি নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেছিলেন তাঁর অসাধারণ সব ছোটোগল্প দিয়ে। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদ সমান তালে তাঁর উপন্যাস দিয়েও দেশ-বিদেশের পাঠককে বই পড়ার প্রতি হারানো আগ্রহটা নতুন করে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। শুধু কি ছোটোগল্প? উপন্যাস, নাটক, শিশুতোষ সাহিত্য, রম্য, ফিকশন, অতিপ্রাকৃত রচনা, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র– সাহিত্যের সব শাখায়ই স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছেন এবং নিজের মুন্সিয়ানাও দেখিয়েছেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পকে শিল্পবোদ্ধারা তুলনা করছেন বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক গল্পগুলোর সঙ্গে। তাঁর গল্পের প্রাণ ছিল পাত্র-পাত্রীদের মিথস্ক্রিয়া। তাদের ছোটো ছোটো সংলাপকে প্রাধান্য দিয়ে গল্প লিখতেন। অতি সাধারণ কথাকে অসাধারণভাবে প্রকাশের এক অন্যরকম ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইউরোপীয় আদলের বাইরে গিয়েও সফল এবং গুণগত মানসম্পন্ন উপন্যাস সৃষ্টি সম্ভব। অতিবাস্তব ঘটনাবলিকে অতি বিশ্বাসী করে উপস্থাপনের ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর লেখনীর এই ধরনকে ম্যাজিকাল রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতা ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়ে থাকে। হুমায়ূন আহমেদের রচনাতে নেতিবাচক চরিত্রও অনেক সময় লাভ করে দরদি রূপায়ণ। বলা হয়, এ বিষয়ে তিনি মার্কিন লেখক স্টেইনবেক দ্বারা প্রভাবিত। হুমায়ূন আহমেদের গদ্যের সহজ-সরল ভঙ্গি পাঠককে মুগ্ধ করে। তিনি গল্প লেখা কিংবা বলার সময় একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন যা গল্পের পাঠককে বাধ্য করে তাঁর সঙ্গে হেঁটে যেতে। আর একজন পাঠক যখন লেখকের সঙ্গে তাঁর রচনা পড়ে হাঁটতে থাকেন তাতেই লেখকের সার্থকতা।

বাংলাদেশের ছোটো গল্পকারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর হিউমার সেন্স অদ্বিতীয়। জীবনের নানা ঘটনাকে, অভিজ্ঞতাকে তিনি এমন নিপুণতার সঙ্গে তাঁর গল্পে বর্ণনা করেছেন যে, পাঠকের কাছে তা অতি পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা বলে মনে হয়। মধ্যবিত্তের পরিবার কাঠামোর মধ্যে ঘটতে থাকা পিতার শাসন, মায়ের আদর, বোনের স্নেহ, মামার পাগলামি, ফুফুর মৃত্যু, বাবার অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য নতুন পোশাক পরতে না পারার দুঃখ, ছোটোবোনের মৃত্যু, বিয়ের দিন বাড়ি থেকে উচ্ছেদ এবং শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দিনগুলোকে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পে সহজভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন। একইভাবে গল্পের মধ্যে আধিভৌতিক এবং কল্পবিজ্ঞানের ব্যাপারটিও অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। 'পিঁপড়া' গল্পটাই যেমন, ডাক্তার নূরুল আফসারের কাছে এক আজব রোগী আসে। সে নাকি যেখানেই যায়, তাকে পিঁপড়া এসে ঘিরে ধরে। এই জ্বালায় সে কোথাও যেতে পারে না। বিভিন্ন পন্থাও সে আবিষ্কার করেছেন পিঁপড়ে আটকাবার কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। খুব হালকাভাবে গল্পটা শুনিয়েছেন গল্পকার অথচ পড়ার সময়ে গা শিউরে উঠবেই পাঠকের। একইভাবে 'অচিন বৃক্ষ', 'ওইজা বোর্ড', ' ভয়', 'জিন-কফিল', 'নিজাম সাহেবের ভূত', 'মৃত্যুগন্ধ', 'নিমধ্যমা', 'যন্ত্র', 'খেলা', 'জীবনযাপন', 'খবিস' ইত্যাদি গল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে এক অদ্ভুত প্লট। আধুনিক বাংলা কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎও তিনি। তাঁর রচিত 'তোমাদের জন্য ভালবাসা' প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসের নাম *নন্দিত নরকে*। উপন্যাসটি ১৯৭১ সালে প্রকাশের কথা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের কারণে তা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর ২য় গ্রন্থ *শঙ্খনীল কারাগার*। তিনি বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ নতুনকরণ কৌশল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলা উপন্যাসকে দেখিয়েছিলেন নতুন দিক। হুমায়ূন আহমেদের লেখা গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে- *নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, লীলাবতী, কবি, সৌরভ, নী, ফেরা, কৃষ্ণপক্ষ, গৌরিপুর জংশন, নৃপতি, অমানুষ, সাজঘর, বাসর, বহুব্রীহি, এইসব দিনরাত্রি, কোথাও কেউ নেই, আগুনের পরশমণি, দারুচিনি দ্বীপ, শুভ্র, নক্ষত্রের রাত, শ্রাবণ মেঘের দিন, জোছনা ও জননীর গল্প, মধ্যাহ্ন, দেয়াল* প্রভৃতি।

বাংলার যুবকদের ওপর হুমায়ূন আহমেদের ছিল এক জাদুকরী প্রভাব। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হিমুকে অনেক সময় লেখক হুমায়ূন আহমেদের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় মনে করা হয়। অনেক যুবকই তাদের কৈশোরের কোনো না কোনো সময়ে নিজেকে হিমু হিসেবে কল্পনা করে থাকে। হিমুর হলুদ পাঞ্জাবি, খালি পা, ভবঘুরে জীবন যুবকদের দারুণভাবে উদ্বেলিত করে। এছাড়া মিসির আলীর মতো রহস্যময় চরিত্র, শুভ্রর মতো অতি পবিত্র চরিত্র এবং রুপার মতো মায়াবতী প্রেমিকা হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম।

হুমায়ূন আহমেদ টেলিভিশনে প্রচারের জন্যও বেশ কিছু নাটক এবং টেলিফিল্ম রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম টিভি নাটক *প্রথম প্রহর* তাঁকে সারা দেশে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর টেলিভিশনে ধারাবাহিকগুলোর মধ্যে– *এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত, অয়োময়, আজ রবিবার, নিমফুল, তারা তিনজন, মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন; শুভেচ্ছা স্বাগতম, সবুজ সাথী, উড়ে যায় বকপক্ষী, এই মেঘ এই রৌদ্র* এখনও ইউটিউবে খুঁজে বেড়ান অনেকেই। *খেলা, অচিন বৃক্ষ, খাদক, একি কাণ্ড, একদিন হঠাৎ, অন্যভুবন*-এর মতো নাটকগুলোর আলোচিত ডায়লগ এখনো অনেকের মুখে শোনা যায়। তাঁর রচিত গানগুলোও বেশ জনপ্রিয়।

বাংলা চলচ্চিত্রের একাধারে চলচ্চিত্রকার এবং পরিচালক ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র ছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। চলচ্চিত্রের নাম *আগুনের পরশমণি*। তাঁর নির্মিত *শ্রাবণ মেঘের দিন* চলচ্চিত্রটি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলোর মাঝে একটি। তাঁর *শ্যামল ছায়া* চলচ্চিত্রটি ২০০৬ সালে সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অস্কার পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তাঁর পরিচালনায় সর্বশেষ সিনেমা ছিল *ঘেটুপুত্র কমলা*। হুমায়ূন আহমেদের চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ছবিগুলোর মধ্যে– *দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, ঘেটুপুত্র কমলা, দারুচিনি দ্বীপ, আমার আছে জল, শঙ্খনীল কারাগার* ও *দূরত্ব* দর্শকদের মন জয় করে। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য হুমায়ূন আহমেদ ১৯৯৪ সালে একুশে পদক লাভ করেন। এছাড়া বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১), হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩ ও ১৯৯৪), বাচসাস পুরস্কারসহ (১৯৮৮) অসংখ্য সম্মাননা পেয়েছেন নন্দিত এই কথাসাহিত্যিক। জাপান টেলিভিশন 'এনএইচকে' হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে নির্মাণ করে ১৫ মিনিটের তথ্যচিত্র 'হু ইজ হু ইন এশিয়া'।

আজ আমাদের মাঝে এই শব্দের জাদুকর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর কথা, তাঁর চিন্তা, তাঁর গল্প, তাঁর জাদু এখনো আমাদের সাথে আছে। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক মুকুটহীন সম্রাট। বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সূর্য।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নবাববাড়ির ঐতিহ্যবাহী পুকুর

নবাবপুর পুকুরে পাঁচ টাকায় করা যায় নবাবি গোসল। শুধু কি গোসল, সাঁতারও কাটা যায় পুকুরের টলমল স্বচ্ছ পানিতে। ঐতিহ্যবাহী নয়নাভিরাম এই পুকুরটির চারপাশ সবুজে ঘেরা। সারি সারি নারকেল গাছ ও নানা বৃক্ষে শোভিত এই পুকুর। পুকুরের পাড়ে দাঁড়ালে দক্ষিণের শীতল হওয়ায় শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই পুকুর। সম্প্রতি সরকার এই পুকুরকে 'ঐতিহ্যবাহী পুকুর' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

উপমহাদেশে নবাবদের শাসন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। রয়ে গেছে তাদের তৈরি প্রাসাদ ও প্রাসাদকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থাপনাসমূহ। পুরান ঢাকার ইসলামপুরে এমনি এক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন নবাববাড়ির পুকুর। একসময় নবাবপুর পুকুরটি ছিল গোলাকৃতির। নবাবরা একে বলত 'তালাভ পুকুর'। মৌলবি খাজা আবদুল্লা ওয়েলকেয়ার রাষ্ট্রের মালিকানাধীন পুকুরই হলো নবাববাড়ি পুকুর। প্রায় সাড়ে সাত বিঘা আয়তন। গোলাকৃতির এই পুকুরটির চারপাশ খুবই পরিচ্ছন্ন এবং এই পুকুরটির চার পাড় তিন দেয়ালের ওপর লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। এ পুকুরের পূর্ব পাড়ের ঘাটে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে গোসল করা যায়।

প্রতিবেদন: আঞ্জুমান বানু

হেমন্ত: কোমল শিশিরের দিন

তনয় সালেহা

ঘাসের শরীরে জমে থাকে ভোরের শিশির। যেন ফোঁটা ফোঁটা মুক্তোর দল। যেন নিষ্পাপ আনন্দের দ্যুতি। সকালের মিষ্টি রোদ এসে যখন ছড়িয়ে পড়ে ঘাসের ওপর, শিশির ফোঁটাগুলো কী যে সুন্দর তখন! রোদ নামে সূর্যের বুক থেকে। ঘাসের ডগা থেকে ঝরে যায় শিশির ফোঁটা। আহা শিশির! মনে হয় রাতের চোখ থেকে নেমে আসা জল। এভাবে হেমন্ত আমাদের উপহার দেয় শিশির ভেজা মিষ্টি সকাল।

হেমন্তের সকাল সত্যিই মনোরম। এই যে সকালের মিষ্টিময় রোদ, এইতো বাংলাদেশের হেমন্তের সকাল। এইতো হেমন্তের শিশির। মাঠ ভরা ধানের শিষে হাসে শিশিরের দল। শিশির শরীরে মেখে নুয়ে থাকে ধানের পাতা।

শিশিরের মতো ভোরবেলা ঝরে শেফালি ফুল। ঝরা শেফালির দেহে মেখে থাকে শিশির শীতল জল। দেখলেই মনে হয় অনন্য সুন্দর জমে আছে শেফালির গায়ে। সাদা পাপড়ি। লালচে-কমলা বোঁটা। মাঝেও লালচে-কমলা। মাটির বিছানায় অথবা ঘাসের বুকে পড়ে থাকে মায়া জড়িয়ে। শেফালির আরেক নাম শিউলি। হেমন্তের এমন প্রাণময় সকাল দেখে যে চোখ; তার থাকে না মনের অসুখ। তার থাকে না দুঃখের দহন। মনের গভীরে জাগে ভালোবাসার সুখ।

হেমন্তের রাত আরো আনন্দের। আরো প্রাণময়। শীতল শীতল প্রবাহ। ঝিরঝিরে বাতাসের বহমানতা। বাতাসের শরীরে ছাতিম ফুলের গন্ধ। মন ভরে ওঠে। ভরে ওঠে বুকের গহীন। ছাতিম সৌরভে মুখর বাতাসেরা যেন সচ্ছল করে জীবনপ্রবাহ। মেঘহীন আকাশ থাকে হেমন্তে। রাতের আকাশ ভরে যায় তারাদের হাসিতে। এত তারা আঁখি মেলে যেন আকাশের কোথাও থাকে না তারাহীন স্থান। জোছনার রাত যেন পাগল করা। শীতল পরশ মাখা হাওয়ার সুখে পাখি হয়ে ওঠে মন।

হেমন্তের দুপুর যখন ডানা মেলে পৃথিবীর বুকে, আহা! কী অপরূপ দৃশ্য ফোটে ভাবা যায় না। অখণ্ড আকাশ। গাঢ় নীল চাদরে মোড়া সমস্ত আকাশের বুক। কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। কোথাও নেই আকাশের কালিমা। যেদিকে তাকাই আকাশের শরীরে কেবল খোলামেলা নীলের বয়ন। দিগন্তজোড়া নীলের উদ্ভাস। যেন দেখে দেখে চোখও নীল হয়ে যাবে। উপরে আদিগন্ত নীল আকাশ। নিচে মাঠঘাট ধানের জগৎ। সোনালি ধানে ধন্য যেন বাংলাদেশের মাটি।

একাকী দুপুরের উদাস করা ক্ষণ। নিঃশব্দে ডানা ছড়ায় চিল ও চাতক। মাঝে মাঝে উড়ে যায় সোনালি ঈগল। ধানের মাঠ থেকে দলবেঁধে ওড়ে চড়ুই পাখির দল। কোথাও নিঃসঙ্গ ঘুঘুর ডাক। ভীষণ উদাস হয়ে ওঠে মন। সোনালি ঝাঁক যেন কখনো কখনো মেঘ হয়ে ওঠে। এ আমার বাংলাদেশের গ্রামীণ হেমন্তের দুপুর।

বিকেল? সেও মায়াবী। ভীষণ মায়াবী। বিকেল কমলা রোদের নরম পশম জাড়ানো। চারদিকে মমতার এক অনন্য দৃশ্য। পাখিরা ঘরে ফেরার দুরন্ত সুখ প্রকাশ করে নিজেদের গানে। ধানের মাঠে কমলা রোদ ঝরে ঝরে পড়ে। আহা! কী যে ছবির মতো মায়াবী রূপ যেন দৃষ্টিকে পাগল করে তোলে। সোনালি ধানে কমলা রোদ যেন এক ধরনের অলংকার। প্রাণের পরশ মাখা সুখ যেন ছড়ানো।

আমাদের নদীগুলোর বুকভরা ঢেউ কমতে থাকে হেমন্তে। পানির প্রবাহ কমে গেলে কমে যায় ঢেউয়ের উত্তাল। বিল-ঝিলের পানি শুকিয়ে যায়। পুকুর-দিঘির পানিও নেমে যায় নিচে। এ সময় ধরা পড়ে নানান ধরনের মাছ। নদীনালা, পুকুর-ঝিলের এবং বিলের মাছের সমাহার দেখা দেয়। দেশীয় মাছের মজা নেবার সময় এই হেমন্ত।

সোনালি ধানের মাঠে মাঠে কৃষকদের ধান কাটার দৃশ্য সে কী জমজমাট। সে কী উৎসবমুখর পরিবেশ। মাঠের বুকের ওপর কাটা ধানের পালি। ধান বেঁধে মাথায় কিংবা ঘাড়ে ভার নিয়ে ছোটে কৃষক। ক্ষেতের আলজুড়ে থাকে কাটা ধানের বিছানি। ধান ঝরিয়েও আবার খড়ের বিছালি রাখা হয় আলে। কদিন থাকার পর ঢাকা ঘাসগুলো সবুজ হারিয়ে সাদা অথবা হলদে সাদা হয়ে ওঠে। এমন ঘাসের ওপরও শিশির পড়ে অদ্ভুত সহজতায়। নাড়ার মাথায় শিশিরের ফোঁটাগুলো অন্যরকম মনে হয়। মনে হয় মৃত দণ্ডের ওপর জীবনের রূপছটা। অথবা নাড়া সজীব রাখার পক্ষে ছড়ানো রাত্রির জল।

হেমন্ত এলেই উত্তর দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে ঝিরি বাতাস আসে। আসে শীতের আগমনী সংবাদ নিয়ে। হেমন্তের হাতে থাকে শীতের নোটিস। থাকে ঘন কুয়াশার অগ্রিম বার্তা। বর্ষায় গাঢ় সবুজ হওয়া বৃক্ষের সারি এবং বনময় তৃণলতা হেমন্তেও সতেজ থাকে বেশ। রাতের শিশির এসব বুনোলতা বৃক্ষকে ডগমগ করে তোলে। ভীষণ তরতাজা এবং প্রাণময় সুখের প্রেরণায় দুলতে থাকে। প্রকৃতিতে এসব সংবাদ নিয়ে আসে হেমন্ত।

আহা! হেমন্ত তোমার নরম কোমল আগমন আমাদের হৃদয়কে কোমল করে তুলুক। আমাদের মনে ও মননে জাগুক মানুষের তরে ভালোবাসা। হে হেমন্ত, আমার তুমি শিশির ও শিউলির আশ্চর্য সুদিন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক: শহিদ নূর হোসেন

মানীষ কুমার

তামাটে শরীর। পায়ে কেডস। পরনে জিন্স প্যান্ট। গায়ের শার্ট কোমরে বাঁধা। খালি গায়ে বুকে-পিঠে সাদা রঙে লেখা গণতন্ত্রের সেই ঐতিহাসিক স্লোগান– 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। গোটা শরীরটাই যেন একটা পোস্টার। ২৬ বছর বয়সি অন্দোলনরত একজন যুবক। যিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মহুতি দেওয়া সাহসী দেশপ্রেমিকদের গর্বিত উত্তরসূরি, আমাদের সংগ্রামী চেতনার আরেক নাম, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে স্মরণীয়। নাম তাঁর নূর হোসেন। তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে স্মরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব এবং প্রতীক। ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলাকালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন নূর হোসেন।

নূর হোসেন ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলাধীন ঝাটিবুনিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা মজিবর রহমান ছিলেন একজন অটোরিকশা চালক। তাঁর মা মরিয়ম বিবি ছিলেন একজন গৃহিণী। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জীবিকার সন্ধানে তাঁর পরিবার ঢাকার বনগ্রামে বসবাস শুরু করে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন বনগ্রামের রাধা সুন্দরী প্রাইমারি স্কুলে। ঢাকার গ্রাজুয়েট হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে নূরের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নূর হোসেন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ঢাকা মহানগর আওয়ামী মটর চালক লীগের বনগ্রাম শাখার প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একত্র হয়ে স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে 'ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি' গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি আদায়। এর পূর্বে এরশাদ ১৯৮২ সালে অবৈধভাবে এক সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরে তিনি পুনরায় ১৯৮৭ সালের এক প্রহসনের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনকে জালিয়াতি বলে অভিযোগ করে। কারণ তাদের একমাত্র দাবি ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা। কিন্তু সে দাবি না মেনেই এরশাদ অবৈধভাবে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। জনগণের মাঝে তীব্র ক্ষোভ জন্মাতে থাকে। প্রতিবাদের অভিনব কৌশল হিসেবে নূর তাঁর বুকে-পিঠে সাদা রঙে লিখিয়ে নেন– 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান। মিছিলটি ঢাকা জিপিও'র সামনে জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি আসলে আন্দোলনরত কর্মীদের ওপর স্বৈরশাসক সরকারের মদদপুষ্ট পুলিশবাহিনীর অতর্কিত হামলা শুরু হয়। এক পর্যায়ে হঠাৎ পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পরেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নূর হোসেন মারা যান। সেদিন নূর হোসেনসহ মোট তিনজন আন্দোলনকারী নিহত হন এবং বহু আন্দোলনকারী মারাত্মকভাবে আহত হন। নূর হোসেনের আত্মদান স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশের আপামর গণতন্ত্রকামী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; ফলে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আরো ত্বরান্বিত হয়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরমধ্যে দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শহিদ নূর হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৯১ সালে তাঁর নামে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১০ই নভেম্বর দিনটিকে প্রথমে 'ঐতিহাসিক ১০ই নভেম্বর দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ দিনটিকে 'শহিদ নূর হোসেন দিবস' করার জন্য সমর্থন প্রদান করে। এরপর প্রতিবছর ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশে 'শহিদ নূর হোসেন দিবস' পালন করা হয়। এছাড়া নূর হোসেন যে স্থানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তাঁর নামানুসারে সেই জিরো পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে 'নূর হোসেন স্কয়ার'।

প্রতিবছর শহিদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দেন। বাণীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের শহিদ নূর হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

১০ই নভেম্বর আন্দোলনরত অবস্থায় নূর হোসেনের মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে তোলা বুকে-পিঠে লেখাযুক্ত স্লোগানটির ছবি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্ব ও বীরত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদেশের সাধারণ মানুষের মনে তিনি জেগে আছেন এবং থাকবেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

টিকা কার্যক্রমে সরকারের সাফল্য

মাসুদ উদ্দিন জুয়েল

আজকের প্রতিটি শিশুই আগামী দিনের উজ্জ্বল বাংলাদেশের কাণ্ডারি। একটি রোগাক্রান্ত সন্তান একটি পরিবারের জন্য অনেক কষ্টের কারণ। তাই দেশের একটি শিশুও যেন রোগাক্রান্ত হয়ে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ রেখে সরকার পরিচালনা করছে বিবিধ কার্যক্রম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে করোনাকালেও সরকারের বিনামূল্যে টিকাদান কর্মসূচি থেমে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক নির্দেশনা ও দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে করোনাকালে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি আরো বেগবান হয়েছে। প্রতিটি শিশুর মায়েরা যেন টিকাদানে উদ্বুদ্ধ হন সে বিষয়ে নিরলস প্রচার ও প্রসারের কাজ করে যাচ্ছে। শহর বা গ্রামের সকল হাসপাতাল, ক্লিনিকের প্রতিটি কেন্দ্রে যেন মায়েরা তাদের শিশুকে টিকা দেওয়াতে নিয়ে আসেন তারজন্য দেশের সর্বত্র প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। আর এরই একটি অংশ হচ্ছে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন– যার সফল বাস্তবায়ন হয়েছে ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত। এই কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে সারা দেশে ১ লাখ ২০ হাজার ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। প্রায় ২ লাখের বেশি স্বাস্থকর্মী ও সেচ্ছাসেবক এই করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্যাম্পেইনের টিকা খাওয়ানোর কাজ চালিয়ে গেছেন।

ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনটি প্রথম শুরু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন দেশে রাতকানা রোগের হার ছিল ৪.১ শতাংশ। এরপর বঙ্গবন্ধু এই রোগ নির্মূলে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই রাতকানা রোগ নির্মূলে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন শুরু করেন। এখন দেশে রাতকানা রোগের হার ১ শতাংশেরও নিচে। একটি পরিবারেও যেন অন্ধ কোনো শিশু না থাকে সে লক্ষ্যেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উদ্যোগগুলো সফল হলে ভবিষ্যতে দেশে আর কোনো রাতকানা রোগী থাকবে না। কোভিড-১৯ মহামারিজনিত কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও নির্দেশনা পালন করে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী।

জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যত ধরনের উপায় রয়েছে, তার মধ্যে টিকা হচ্ছে অন্যতম সাশ্রয়ী একটি উপায়। আর বাংলাদেশ সরকার এই টিকাগুলো বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশসহ প্রায় ১০০টি দেশে নিয়মিত টিকাদান এবং রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার জন্য বছরে ২০০ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ কিনে থাকে ইউনিসেফ। বাংলাদেশের জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির আওতায় যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পেরটুসিস বা হুপিং কফ, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি, নিউমোকক্কাস, পলিও মেলাইটিস, হাম ও রুবেলাসহ ১০টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় পুষ্টি সেবা, জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান প্রতিবছরই জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন করে থাকে। করোনা মহামারি কারণে প্রতিবছর জুনে শুরু হওয়া ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয় ৪ঠা অক্টোবর। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকা শিশু হাসপাতালে এ ক্যাম্পেইনের উদ্‌বোধন করেন। দুই সপ্তাহব্যাপী ধাপে ধাপে সারা দেশে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন চলে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। আর ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত আরো চারদিন দুর্গম এলাকায় চলে এই ক্যাম্পেইন।

এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ভিটামিন সবার জন্য প্রয়োজন, তার মধ্যে ভিটামিন 'এ' গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন 'এ' কেবল রাতকানা প্রতিরোধ করে না, এর মাধ্যমে শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তবে একটি শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধ সবচেয়ে বেশি আদর্শ খাবার, পাশাপাশি দরকার অন্যান্য সুষম খাবার।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতার পর ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের অভাবে শতকরা চার শতাংশের বেশি শিশু রাতকানা রোগে ভুগতো। অনেক শিশু অন্ধ হয়ে যেত। আজ সে অবস্থা নেই, পরিবর্তন হয়েছে। রাতকানা রোগ এখন এক শতাংশের নিচে। আগামীতে এটাও থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এবার সারা দেশে প্রায় ২ কোটি বিশ লাখ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ৬-১১ মাস বয়সি শিশুদের ১টি নীল রঙের ১ লাখ আই ইউ এবং ১২-৫৯ মাস বয়সি শিশুদের ১টি করে লাল রঙের ২ লাখ আই ইউ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন টিকা দেওয়া হয়।

করোনার মধ্যে এ ক্যাম্পেইন চলাকালে স্বাস্থ্যকর্মীরা ও সেচ্ছাসেবীরা ব্যবহার করেছেন করোনা সার্জিক্যাল মাস্ক এবং মেনেছেন পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি। স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা নিয়মিত কোভিড-১৯ স্ক্রিনিংয়ের অধীনে থেকেছেন। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, এ পর্যন্ত ৯৮ শতাংশ শিশু ভিটামিন 'এ' টিকা পেয়েছে। শিশুদের এ টিকা নিতে হবে ভরা পেটে এবং করোনা আক্রান্ত শিশুও এ টিকা নিতে পারবে। শুধু মাত্র শিশুর যদি শ্বাসনালির অসুস্থতা বা শ্বাসকষ্ট অথবা কোনো মারাত্মক অসুস্থতা থাকে তবে তাকে সুস্থ হয়ে পরে এ টিকা প্রদান করা যাবে। এবার ৬-১১ মাস বয়সি ২০ লাখ ৪০ হাজার শিশুকে নীল রঙের ক্যাপসুল এবং ১২-৫৯ মাস বয়সি প্রায় ১ কোটি ৯৩ লাখ শিশুকে লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। ক্যাম্পেইন চলাকালে যে শিশুরা বাদ পড়েছে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেসব শিশুদের এ টিকা খাওয়ান।

ভিটামিন 'এ' শুধু অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে শিশুদের রক্ষা করে তাই নয়, ভিটামিন 'এ' শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও জটিলতা কমায় এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি কমায় ।

করোনা মহামারিতে বাবা-মা, কমিউনিটি ও স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রগুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার পরও বাংলাদেশে মাসিক টিকা নেওয়ার হার কোভিড-১৯-এর আগের পর্যায়কে ছাড়িয়ে গেছে। আর এই অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে ইউনিসেফ।

বাংলাদেশের ইউনিসেফের উপপ্রতিনিধি ভিরা মেন্ডোনকার বলেন, এটি বাংলাদেশ সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং এই কার্যক্রম নিঃসন্দেহে শিশুর জীবন বাঁচাবে। এই গতি যাতে বজায় থাকে এবং কোনো শিশু যাতে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য টিকাদান কার্যক্রমে সহায়তা অব্যাহত রাখতে ইউনিসেফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

সচেতনতাই নিউমোনিয়া থেকে শিশুমৃত্যু রোধ করবে

রিপন তাহেরী

প্রতিবছর ১২ই নভেম্বর বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস পালন করা হয়। নিউমোনিয়া রোগ এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা গড়ে তুলতে এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। নিউমোনিয়া বাচ্চাদের পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে ঘটে থাকা মারাত্মক রোগগুলোর মধ্যে একটি।

নিউমোনিয়া হলো উভয় বা একটি ফুসফুসে টিস্যু প্রদাহ। এটি একটি জটিল সংক্রমণ, যা প্রাথমিকভাবে ফুসফুসের বায়ুথলি আলভিওলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দেশে এখনো বছরে প্রায় ২০ হাজার শিশুর মৃত্যু হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ১০ বছর আগে এ সংখ্যা আড়াই গুণ বেশি ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষা বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রতি ২০ সেকেন্ডে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে একজন করে নিউমোনিয়ায় প্রাণ হারায়। পাঁচ বা এর চেয়ে কম বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের (পিএইচসি) সূত্রে জানা গেছে, দেশে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২২ শতাংশ শিশুর মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে শূন্য থেকে দুই বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা ৯০ শতাংশ।

বিভিন্নভাবে নিউমোনিয়া ছড়াতে পারে। যেমন–

- শ্বাস নেওয়ার সময় বাচ্চার নাক বা গলার মধ্যে থাকা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ফুসফুসকে সংক্রমিত করতে পারে।
- হাঁচি-কাশির ফোঁটা থেকেও জীবাণু ছড়াতে পারে।
- বাচ্চার জন্মের সময় বা তার ঠিক পরে রক্তের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায়

- কাশি এবং শ্বাসকষ্ট, যা জ্বরসহ বা জ্বর ছাড়া হতে পারে।
- দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বা নিম্ন বক্ষ প্রাচীরের ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া।
- অসুস্থ বাচ্চাদের পান করতে বা খেতে অসুবিধা হয়।
- রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, হাইপোথার্মিয়া এবং খিঁচুনি দেখা দিতে পারে।

যেভাবে নিউমোনিয়ায় ঝুঁকি বাড়ে

- যেসব শিশু অপুষ্টি বা অসুস্থতায় (এইচআইভি, হাম) ভুগছে।
- পরিবেশগত কারণ।
- ঘরের অভ্যন্তরে বায়ুদূষণ (জ্বালানি হিসেবে কাঠ বা খড়কুটো ব্যবহার করার ফলে)।
- ঘরের মধ্যে অনেকে বসবাস করলে ধূমপান থেকে প্যাসিভ স্মোকিংয়ের কারণে।

নিউমোনিয়ার কারণে শিশুর মৃত্যুর হার কমানোর তিনটি ধাপ যেমন:

১. **শিশুর অসুস্থতা চেনা:** শিশুর যত্নের দায়িত্বে যারা আছেন প্রথমেই তাদের উচিত নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো এবং কাশি বা দ্রুত অথবা কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো শিশুর বিপজ্জনক উপসর্গগুলো চেনা।

২. **সঠিক যত্নের সন্ধান:** নিউমোনিয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে এমন শিশুদের জন্য সঠিক চিকিৎসার সহায়তা নেওয়া।

৩. **অ্যান্টিবায়োটিকসহ সঠিক চিকিৎসা:** স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকসহ নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করবেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টিকাদান কর্মসূচি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। কয়েক বছর হিব-ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর ২০১৫ সাল থেকে অধিক কার্যকর প্রতিষেধক নিউমোকক্কাস ভ্যাকসিন (পিসিভি) প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে নিউমোনিয়া সংক্রমণ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৩৭ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩৩ লাখ শিশুকে এ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে বছরে ৯৩ লাখ ৫০ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়। নিউমোনিয়ার ঝুঁকিতে থাকা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় দুই লাখ শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

ঢাকা শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ওপর যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে ঢাকা শিশু হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ ও বাংলাদেশ চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন। তাদের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, গত তিন বছরে গড়ে প্রায় ৫০ হাজার শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছে। তাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

ঢাকা শিশু হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. প্রবীর কুমার সরকার বলেন, নিউমোনিয়ায় শিশু আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য জন্মের পর ছয়মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে থাকা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি মা ও পরিবারের সবার স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে বলে মনে করেন তিনি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জনপ্রিয় সিনেমা নির্মাতা কাজী জহির

আপন চৌধুরী

চলচ্চিত্র একটি প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প, বাণিজ্য ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। সপ্তকলার সমন্বয়ে এ মাধ্যমটি গড়ে উঠলেও এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যম। একমাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র জানতে পারি। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়েছে ১৮৯৮ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে। তারপর ধাপে ধাপে আমাদের ঢাকা তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে। বিএফডিসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই আব্দুল জব্বার খানের একক প্রচেষ্টায় পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) মুক্তি পায়। এরপর হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠা করলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সোনালি দিনের সূচনা হয়।

আমাদের রয়েছে হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে ধারণ করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা অবদান রেখেছেন। বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক কাজী জহির তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কাজী জহির রুচিশীল দর্শকের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দর্শকের মনে জায়গা করে নেন। তাঁর *ময়নামতি*, *অবুঝ মন*, *বধু বিদায়*, *ফুলের মালা* প্রভৃতি ছবিগুলোতে গ্রাম বাংলার সমাজ বাস্তবতার চিত্র ফুটে ওঠে। কাজী জহির বিশিষ্ট নির্মাতা জহির রায়হানের প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র *কখনো আসেনি* (১৯৬১) প্রযোজনা করে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে নিজেই চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসেন। কাজী জহির তখন নটরডেম কলেজের অধ্যাপক। তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র *বন্ধন* (১৯৬৪)। এরপর একে একে আরো সাতটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। প্রযোজনা করেন আরো আঠারোটি চলচ্চিত্র। তাঁর শেষ পরিচালিত ছবি *ফুলের মালা* (১৯৮৭)। তাঁর পরিচালিত সবগুলো ছবিই ছিল দর্শক নন্দিত ও সুপারহিট। তিনি চলচ্চিত্রের কাহিনির মাধ্যমে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর ছবির গানগুলোও ছিল দারুণ জনপ্রিয়। তাঁর সবগুলো সিনেমার নায়ক-নায়িকা ছিল তখনকার সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী। তিনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চিত্রা ফিল্মস থেকে সবগুলো চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। এর বাইরে তিনি অন্য পরিচালকদের দিয়েও চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কাজী জহিরের মৃত্যুর পর চিত্রা ফিল্মস থেকে নির্মিত হয় কাজী হায়াৎ পরিচালিত *মিনিষ্টার* (২০০৩) ও *আমার স্বপ্ন* (২০১০)। চিত্রা ফিল্মস থেকে সর্বশেষ প্রযোজিত ছবি জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত *অনেক সাধের ময়না* (২০১৪)। কাজী জহির ১৯৮২ সালে নাগর মহল সিনেমা হল সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে চিত্রামহল সিনেমা হল নামে চালু করেন তাঁতী বাজার মোড়ে। কাজী জহির ৮টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন ও তাঁর চিত্রা ফিল্মস থেকে ১৮টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

কাজী জহির নিজেই বলতেন যে,'শরৎচন্দ্র, নীহাররঞ্জন ও বঙ্কিমচন্দ্র যদি এদেশের পাঠকচিত্তে বেঁচে থাকেন তাহলে তিনিও দর্শকচিত্তে বেঁচে থাকবেন'।

কাজী জহিরের মধ্যে দ্বৈতসত্তা সক্রিয় ছিল। তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে অনেক সময় তা প্রকাশ পেত। যেমন তিনি এখন যে কথাটি বলেছেন, আধা-ঘণ্টা পর দেখা যায় তারই বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন বিরোধী-মৈত্রী সম্পর্কের ওপর বিশ্বচরাচর প্রতিষ্ঠিত। একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এ দর্শনের প্রচারক ছিলেন ফরাসি দার্শনিক অঁরি বেয়র্গসোঁ। তিনি তাঁর মানস সন্তান হতে চাইছেন কি-না? জবাবে তিনি হেসেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত এ চরিত্রের প্রতিফলন তাঁর কোনো ছবিতে পাওয়া যায়নি। যেহেতু তিনি তাঁর ছবির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন শরৎ, বঙ্কিম এবং নীহার থেকে সেহেতু তিনি তাঁর জীবন দর্শনকে ছবিতে কাজে লাগাননি।

কাজী জহির পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলো হলো– *বন্ধন* (১৯৬৪), *ভাইয়া* (১৯৬৬), *নয়ন তারা* (১৯৬৭), *ময়নামতি* (১৯৬৯), *মধুমিলন* (১৯৭০), *অবুঝ মন* (১৯৭২), *বধু বিদায়* (১৯৭৮) ও *ফুলের মালা* (১৯৮৭)। কাজী জহির ও তাঁর চিত্রা ফিল্মস থেকে প্রযোজিত ছবিগুলো হলো– জহির রায়হান পরিচালিত *কখনো আসেনি* (১৯৬১), সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া পরিচালিত *দস্যুরাণী* (১৯৭৩), মোস্তফা মেহমুদ পরিচালিত *অবাক পৃথিবী* (১৯৭৪), বাবুল চৌধুরী পরিচালিত *চাষীর মেয়ে* (১৯৭৫), এফ এ বিনু পরিচালিত *রাজরাণী* (১৯৭৬), আকবর কবীর পিন্টু পরিচালিত *কথা দিলাম* (১৯৮০), নূর মোহাম্মদ মনি পরিচালিত *রাণী চৌধুরাণী* (১৯৯০), কাজী হায়াৎ পরিচালিত *মিনিষ্টার* (২০০৩), কাজী হায়াৎ পরিচালিত *আমার স্বপ্ন* (২০১০) ও জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত *অনেক সাধের ময়না* (২০১৪)। কাজী জহিরের জন্ম ১৯২৭ সালের ১০ই অক্টোবর পুরনো ঢাকার বংশালের আব্দুল্লাহ সরকার লেনের বিখ্যাত সাত বাড়িতে। বিশিষ্ট সাবরেজিস্টার মৌলবি ইউসুফ ও বিবি আয়েশার ঘরে ২ ভাই ২ বোনের সংসারে কাজী জহির দ্বিতীয়। কাজী জহির শুধু চিত্র প্রযোজক এবং পরিচালকই ছিলেন না, তিনি একজন প্রদর্শকও। স্থানীয় চিত্রামহল সিনেমা হলের মালিক তিনি। নায়িকা ও প্রযোজিকা চিত্রা জহির তাঁর স্ত্রী। কাজী জহিরের তিন ছেলে-মেয়ে। পুত্র কাজী আজহার, দুই মেয়ে ঝিনুক এবং শাপলা। ১৯৯২ সালের ২০শে অক্টোবর বিখ্যাত এই নির্মাতা মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কাজী জহির। তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন আজীবন।

লেখক: চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখক, গবেষক ও নির্মাতা

তখন লকডাউন

কাবেরী বসু

শাহ্‌রিয়ার মানসিক বেড়াজালে আটকে গেল। সে যুগপৎ অবাক ও ভয় পেয়েছে। এত স্পষ্ট করে দিব্যি শুনছে চারতলা থেকে পায়রার ছানা নিয়ে দরাদরি। বিক্রেতা বিনীত স্বরে যে দাম হাঁকছে, ক্রেতার কণ্ঠের কঠোরতা তাকে দাবিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় একটি লোকেরও উপস্থিতি সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে থাকবার কথা নয়– দেয়াল ঘড়িতে তাকিয়ে ভাবে শাহ্‌রিয়ার। বিছানায় সে শুয়ে আছে। বিক্রেতা সরল কণ্ঠে– না, জোড়া ২০ টাকার কমে বেচতাম না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্ষেপে গেছে সে। বিক্রেতা মনে হয় ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল– বাবা, সব তাঁর ইচ্ছা।

বাঞ্ছারামপুর থেকে রাইতে রাইতে এখানে ক্যান আইলাম। কন বাবা, কে আইতে কইল? কারো আর কোনো কথা শোনা গেল না। না, এত স্পষ্ট কথা কানে আসছে কোথা থেকে। কোনো মানসিক ব্রেক-ডাউন থেকে! আজ টানা কুড়িদিন পড়ল করোনার সৃষ্ট আপদ লকডাউন। দেশে করোনা বিস্তার লাভের পর সর্বাগ্রে সতর্কতা নিয়েছে সরকার। মুজিব শতবর্ষ পালনের আনুষ্ঠানিক সব অনুষ্ঠান বাতিলের নোটিস জনসমক্ষে প্রচারিত হয় এর কয়েক দিন পর। চারতলা বাসার ওপরে ছাদ। না, ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। ব্যায়াম করা উচিত। না, হলো না।

প্রতিদিনের ব্যায়াম ছেড়ে দিয়েছে। যেন মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। নিজের ঘরে শুয়ে কাটায়। স্ত্রী টিভি প্রোগ্রাম দেখার জন্য নিয়ে যেতে চাইলেও যায় না। সন্তানদের সঙ্গে গিন্নী থাকে। ছেলেমেয়েরা বড়ো হচ্ছে। এখন সে ছোটো মেয়ের সঙ্গে এক খাটে ঘুমায়। খাট এতটা বড়ো মনে হয় ৭/৮ জন শোবার পরও ফাঁকা থাকবে বিছানা। শাহ্‌রিয়ার সন্তানদের ঘরে যায় না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব বারান্দায় চলাফেরা করে সে। পাশের বাড়িগুলোর লাগোয়া বাসিন্দাদের সবাই ওর স্বভাবটি জানে। ও যেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতো, চিৎকার করে কেউ যেন বলত, দেখ সাড়ে তিন হাত সূর্য। বাসার দুটি বারান্দা বন্ধ করে রান্নাঘর আর বসার ঘরের পরিসর বাড়ানো হয়েছে। ভেতরের দিকে লিভিং রুমের পরিসরও বেড়ে গেছে। স্ত্রী এসব করে থাকে। এবার পূর্বের বারান্দায় সংস্কার হবে অর্থাৎ এ বারান্দা বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘর বড়ো করা হবে। থাই গ্লাস আটকে গেছে বন্ধ বারান্দায়। বিশাল জানালা, ভারি পর্দা, কখনো মেলে, কখনো একদিকে জড়ো করে রাখা হয়। আছে শুধু পশ্চিমের বারান্দা। আশপাশেও বেশ পরিবর্তন, এত সব খানাখন্দ, ডোবানালা বুজিয়ে একের পর এক ১২ তলা-১৪ তলার মধ্যে নিজেদের বাড়িটা কেমন যেন পড়ে থাকা এক বিষণ্ন আলমারির মতো লাগে। এবার শুধু পূর্বের জায়গা

বড়ো হবে। এই পূর্ব দিকটা এখনো খোলা। পূর্ব দিকে স্কুল ও মসজিদের পাশাপাশি অবস্থান। স্কুলের প্রবেশপথ প্রশস্ত করবার জন্যে প্রবেশপথ ভেঙেচুরে পিছিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ওপরের ক্লাসগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে। তাই মসজিদও দখলে থাকা কিছু জায়গা ছেড়েছে। মসজিদের জায়গায় ভাড়া দেওয়া একটি দোকান উঠিয়ে দিয়ে তা ভেঙে জায়গা মসজিদের ভেতর নেওয়া হয়েছে। এখানে থাকে জানাজার লাশ। লোক বেশি হলে স্কুলের খেলার মাঠ প্রাঙ্গণে লাশ নিয়ে যাওয়া হয়। স্কুল, মসজিদ, বাড়ি– সব বহুতল হচ্ছে। স্কুলের সামনের গলির রাস্তাটি বড়ো থাকায় ভালো হয়েছে। নিজের গাড়ি নিয়ে চলা যায়। রাতে এসে দাঁড়ায় ট্রাক নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে। আর মোড়ে সকালে বসে একেক দিন একেক জন। ভ্যানে মুরগি, ডিম, ফার্মের মুরগির ছোটো ছোটো বাচ্চা নিয়ে বসে। কেউ যদি কিনে বাড়ি নিয়ে পালেপোষে। আবার কোনোদিন আম, জাম, আপেল, আনারসওয়ালাকে চারতলা থেকে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখতে ভালোই লাগে। নিজের ঘরে পড়ার টেবিল, বিছানা ইত্যাদি নিয়ে শাহ্‌রিয়ারের দুনিয়া। স্ত্রীকে ডাকতেই ও দরজা ঠেলে এল। শাহ্‌রিয়ার বলল– কিছু শুনছ? ওহ্ তাইতো। কেউ বোধহয় পায়রার ছানা বেঁচতে চায়। কে ? এমন গজবের দিনে এখানে কে এল মরতে? উঁকি মেরে দেখে... আরে দেখ! একটা প্যাডেল মারা ভ্যান। আর পাশের মোড়ে ওয়ালক্লথ বিছিয়ে একটা গ্রামের লোক। পাঞ্জাবি পরা, পাশে ভ্যান গাড়িতে বসা সম্ভবত ওর ছেলে।

শাহ্‌রিয়ার ভাবল নিচে যাবে। তবে দূরত্বে থাকবে। নিচতলা থেকে স্কুলের মোড়ে এসে দাঁড়ায় সে। নেমে দেখে অদ্ভুত ঘটনা। মনে হয়, এক চিকিৎসক দম্পতি। উভয়ের শরীরে সাদা অ্যাপ্রোন। গাড়িতে বসে আছেন, পাশে স্ত্রী। বোধহয় ভুল করে এই গলিতে ঢুকে পড়েছিলেন। গাড়ি ঘুরিয়ে বের হয়ে যাবেন। স্ত্রীর চিৎকারে সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন থামালেন। ওনার থেকে কয়েক হাত দূরে শাহ্‌রিয়ার। শোনা গেল, বাহ্! সবগুলো নিয়ে চল। স্ত্রীর কথায় তিনি দেখতে পেলেন পায়রাওয়ালাকে। শোনা গেল ভদ্রলোকের সন্তুষ্টির স্বর! প্রতিদিন মাকে পায়রার বাচ্চার স্যুপ করে দিতে পারব। হাঁক দিলেন গাড়ি থেকে। সবগুলো মিলে কয়টা হবে? বিক্রেতা জবাব দিল– একশ'র বেশি। পায়রার ছানাগুলো একটি বড়ো টুকরিতে সাজিয়ে রাখেন। ডাক্তার বললেন, পেছনের ডালায় না রেখে পেছনের সিটে পায়রার বাচ্চাগুলো সাজিয়ে রেখে দিন। গাড়ির পেছনের দরজা দুটো খুলে গেল। বিক্রেতা সেই মতো সবগুলো সাজিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, প্রতিটির দাম একশ টাকা করে ১০ হাজার টাকা। আর দুটি বড়ো হাঁসের জন্য আরো ২ হাজার। বিক্রেতা বিস্ময়ে! এত টাকা দেবেন? আরে কী বলেন, আমাকে এর থেকে বেশি দিতে হলেও দেব। মায়ের বুকে ঠান্ডা বসে যায়। ওষুধের চাইতে পায়রার ছানার স্যুপে উপকার তিনি বেশি পান। মা পায়রা ছানার গোশত ও নরম হাড় খেতে পছন্দ করেন। স্ত্রীও বোধহয় মাতৃভক্ত স্বামীর এ স্বভাবটিকে পছন্দ করেন। নইলে এতক্ষণ ধরে চুপ থাকতেন না। তিনি বলে চললেন, মা-তো তার নাতনির সঙ্গে একসাথে বসে এই হাড়গোশত একত্রে কাড়াকাড়ি করে খান। আর কেবল বলবে, দেখ আমি কত স্মার্ট। কত তাড়াতাড়ি খেতে পারি। বাসার সবাই ঘাড় দুলিয়ে শুনবে, আর হেসে উঠবে। বলবে, ঠিক ঠিক। তোমার খাওয়ার অপেক্ষায় থাকলে ট্রেন চলে যাবে ভোঁ করে। মেয়েটি এ কথার মানে না বুঝে বলে একদম ঠিক। ট্রেনও স্মার্ট হয়ে গেছে। বাসায় আবার হাসির হর্‌রা...

পায়রাওয়ালা বলল, বাবা, একটা কথা কই শোনেন। পরশু শেষরাতে মনে হলো কে যেন বলছে, তোর পায়রা নিয়ে বাসাবো কদমতলা স্কুলের মোড়ে যা। দুইদিন লাগিয়ে স্কুলের এখানে আসছি। মেয়ের সম্বন্ধ আসবে সামনের জুম্মাবারে। কিছু টাকাতো এল। বাকিটা ধারকর্জ করে চলবে। ডাক্তার শুনে বললেন, বিয়ে ঠিক হয়নি? জবান হইছে। ছেলের বন্ধু আর চাচা এসে পান-সুপারি করে গেছেন। সামনে আসবেন বিয়াইসাব। বিয়া হবে এ মাসের শেষে। এখন পিছাবে... এই গজব দূর হলে বিয়ার ডেট হবে। ছেলে ছয়মাস পরে মক্কায় যাবে। অনেক ছুটি নিয়ে প্রায় ১০ বছর পর দেশে ফিরেছে। বেতন তো ভালোই পায় কিন্তু ধারও মেলা।

বেশ তো আগামী জুম্মার পরের জুম্মায় আসেন আমার বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না। বাইরের ঘরের ছাউনির নিচে বসবেন, খাবেন। বাঁ পাশ দেখিয়ে– আমার স্ত্রী! ইনি আপনার মেয়ের সোনার হার, কানের দুল, বিয়ের লাল শাড়ি, জোড়া বদলানোর শাড়ির টাকা দেবেন। এটা কিন্তু জাকাতের টাকায় নয়। প্রতিবছর আমি হয়ত কোনো মেয়ের বিয়ের জিনিসপত্র, গয়নাগাটি, কাপড়চোপড় দিয়ে থাকি। শাহ্‌রিয়ার ভাবল একেই বলে সহবত, বিনয়!

পায়রাওয়ালার দুচোখ বেয়ে পানি নামছে। মোনাজাতের স্বর শোনা গেল... গায়েবি আওয়াজ পাইলাম। আল্লাহ যা আইজ পাইলাম তাতো রাজারাও দেয় না!

ইতোমধ্যে ভ্যানওয়ালা এসে গেছে। তাকেও তিনি দিলেন ১০ হাজার টাকা। ডাক্তার বললেন, সবাইকে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যাকেই দেব তিনি যেন কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। পায়রাওয়ালাকে দেখিয়ে বললেন– ওনাকে নিয়ে নরসিংদী ফেরত যান। আপনার ভাড়া আরো ১০ হাজার টাকা পাবেন। আমার এক লোক ওই খেয়াপারে থাকবে। ভ্যানওয়ালার নজর এড়িয়ে আরো ১০ হাজার টাকা দিলেন তিনি। ভ্যানওয়ালা শুনতে পাবে না এমন নিচু গলায় অদূরে দাঁড়ানো পায়রাওয়ালাকে বললেন, এই টাকা বের করবেন না। পথে ওকে কিছু টাকা দিয়ে খাবার বা কোনো বাড়ির কলা, মুড়িমুড়কি, ভাত কিনে আনতে পাঠাবেন। অথবা ওকে দিয়ে কোনো বাড়ির কলার ছড়া কেনার কথা বলে চারদিক তাকিয়ে আপনার টাকা, ভাড়ার টাকা রেখে, আপনার কোমরের খুঁতি ছেলের কোমরে বেঁধে দেবেন। তাহলে পথে বেশি নিরাপদে থাকতে পারবেন। সাথে নিজের কাছে এক-দেড় হাজার টাকা নগদ রাখবেন, বিপদে পড়লে অল্পের ওপর যাবে। বাকিটা আল্লাহর হাতে! ভদ্রলোক আর কোনো কথা বললেন না।

ডাক্তার ভদ্রলোক নিজের নেম কার্ড স্কুলের প্রবেশপথে উঁচু জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে রেখে দিয়ে গাড়িতে এসে বসেছেন। ওখান থেকে কার্ড নিলেন পায়রাওয়ালা। গাড়িটি বের হবে তখনি শাহ্‌রিয়ার তাজ্জব হয়ে শোনে, সমস্বরে পাড়ার সবলোক বলছে, খোদা হাফেজ ডাক্তার সাহেব, বেঁচে থাকুন আপনি।

ডাক্তার ও তার স্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে সবাইকে সালাম দিলেন। নিজের ভিজে ওঠা চোখ দুটো সামলাতে মাথা নিচু করে গাড়িতে এসে বসলেন ডাক্তার। পাশের দরজা দিয়ে তার স্ত্রীও চলে এলেন গাড়িতে।

যুদ্ধজয়ের কবি

শাফিকুর রাহী

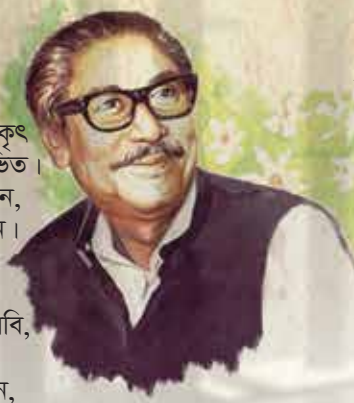

মুজিব আমার জাতির পিতা আলোর পথিকৃৎ
যে মহাবীর দুঃশাসনের ভাঙলো আঁধার ভিত।
মুজিব আমার অগ্নিদিনের রক্তপলাশ ফাগুন,
বাঙালিকে জ্বালাতে বলে যুদ্ধজয়ের আগুন।
মুজিব আমার অনন্তকাল স্বপ্ন ভালোবাসা
জয় বাংলা, জয় বাংলা বিশ্বজয়ের ভাষা।
মুজিব আমার মেঘলাকাশে ঝলমলে এক রবি,
বাঙালিদের মহামানব যুদ্ধজয়ের কবি।
মুজিব আমার রক্তে জাগায় বিপ্লবেরই গান,
এক মুজিবের নামে জাগে লক্ষ কোটি প্রাণ।
মুজিব আমার সত্যজয়ে লড়তে শেখায় মরতে,
অধীনতার শিকল ছিঁড়ে সূর্যসিঁড়ি গড়তে।
মুজিব নামে জনম জনম লড়বো জীবনভর,
মুজিব, মুজিব বলবে আকাশ বাতাস নিরন্তর।
মুজিব আমার হাজার যুগের সূর্য রঙিন লাল,
এই মাটিতে থাকবে জেগে মুজিব চিরকাল।
মুজিব আমার ভালোবাসার স্বপ্নজয়ের রথ,
স্বাধীনতার কাব্যকথা, কম্পিত রাজপথ।
মুজিব আমার নীলচে আকাশ উদার সমুদ্দর–
ষড়যন্ত্রের প্রাচীর ভাঙা কালবৈশাখির ঝড়।

প্রিয় হেমন্ত আমার

জাকির আবু জাফর

হেমন্তের যত গান যত আনন্দ ধ্বনি আমার প্রাণের গভীরে
মিশে আছে দ্রবীভূত বাষ্পের মতো
প্রাচীন পাখির ন্যায় বাসা বেঁধেছে বুকের বিবরে
তারই ভেতর বেজে ওঠে অজস্র শতাব্দীর গান
সুদীর্ঘ আঁধার ভেঙে জেগে ওঠে আমার সুদিন
আমার আশ্চর্য আনন্দের ভোর
কিছুটা শিশির মাখা কিছুটা কুয়াশা হিম
বাকিটা কোমল আর্দ্রতায় অবনত নীলের উঠোনে
কেউ যেন লিখে গেছে–হেমন্তের নাম
হেমন্ত আমার হেমন্ত
পাতার শরীরে আঁকা রোদের নকশা
বিজয় বাতাসে দোলা ছায়ার চিত্রিতা
এবং শূন্যের হৃদয়ে রোমাঞ্চিত নীলের নগ্নতা
পাঠ করি আমি
একান্তে ডেকেছি তোমাকে হে আমার হেমন্ত
আমার তৃষ্ণায় ছুয়ে যাও আমার অন্তর
যাও ধীরে অতি ধীরে তৃপ্তির সুখের মতো
আমি পাঠ করি তোমার প্রান্তর
তোমার তরঙ্গময় ধানের জগৎ এবং
সকল উদয় অস্তের অন্তর্গত আয়োজন
আরম্ভ থেকে সমাপ্তির সূচনা পেরিয়ে
পৃথিবীর শ্যামচিত্রের রেখাগুলো রেখে
আমি দাঁড়িয়েছি তোমার উষাময় নদীর শিয়রে
সদ্য ঝরা শরতের প্রিয়তম বোন তুমি
মেঘের নগর থেকে নেমে এলে ধানের দেশে
ও প্রিয় হেমন্ত
আমার দুটি হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকো ছাতিম তলায়।

জেল হত্যা

আবুল হোসেন আজাদ

ইতিহাসের সেই কলঙ্কিত কালো অধ্যায়
তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস
আবার এসেছে ফিরে
ব্যথার পুষ্পে প্রস্ফুটিত হয়ে।
বঙ্গবন্ধুর চার সহযোদ্ধা
স্বাধীনতার সূর্য সৈনিক ওরা
সৈয়দ নজরুল,তাজউদ্দীন, ক্যাপটেন মনসুর ও কামারুজ্জামান
শাহাদতের পেয়ালায় চুমুক দিলেন
কারা অভ্যন্তরে; ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকদের বুলেট-বেয়নেট
যেন মেঘে ঢেকে গেল তেজদীপ্ত সূর্য।
কষ্টের বারি বর্ষণে ভেসে গেল হৃদয়ের গহীন জমিন
সাথে কালবৈশাখির ঝড়ে তছনছ সাজানো বনভূমি
রক্তের স্রোত তামাটে কারাকাষ্ঠের অভ্যন্তরে
আর এক নিষ্ঠুরতা দেখল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ।
ওরা চেয়েছিল–
বঙ্গবন্ধুর সাথে চার নেতার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে
জাতিকে মেধাশূন্য করে
ক্ষমতার লালসা চরিতার্থ করতে
বঙ্গবন্ধুর হত্যার ধারাবাহিকতায়
এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলল নরঘাতকেরা।
রাত কেটে হলো ভোর, মেঘ সরে আবার উঠল সূর্য
চাঁদ ঢেলে দিল জোছনা
তারারা মিটিমিটি জ্বলল মেঘহীন নীলিমায়
সব ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে জেগে উঠল বাংলাদেশ–
আপামর জনতার ভালোবাসা শ্রদ্ধায় প্রেমে।
নৃশংস দিন পঁচাত্তরের জেল হত্যা দিবস
মোছা কি যায়? হৃদয়ের পাতা আসন সরিয়ে?
শোকাতুর আমরা স্মরণ করি তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে
তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবসে।

হেমন্ত

আহসানুল হক

শরৎ শেষে এল আবার
এল যে কাল হেমন্ত
ঝিঙে মাচায় ফুল ফুটেছে
মন করে যে কেমন তো!
বকের সারি যায় উড়ে যায়
দূর নীলিমায় সাঁঝে
শীতের আভাস টের পাওয়া যায়
ঠান্ডা হাওয়ার মাঝে!
ভোর সকালে শিশির জমে
পাতার ভাঁজে ভাঁজে
কৃষানিদের বুকেতে ভাই
আনন্দের সুর বাজে!
ক্ষেতের দৃশ্য হয় অপরূপ
পাকা সোনা ধানে
কৃষক-কৃষান উঠে মেতে
নবান্নেরই গানে!

হযরত মুহম্মদ (স.)

ম. মীজানুর রহমান

প্রাণপ্রিয় হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম,
যতকাল বেঁচে থাকি মনে রাখি তোমারই অম্লান চির পবিত্র চির সুন্দর নাম।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আর নক্ষত্র অপার যত আছে ঐ অসীম আকাশের গায়,
বিশুদ্ধ তোমার নামের সাথে করুণাময় আল্লাহর নাম হৃদয়ে জপিয়া যায়।
পাহাড়-পর্বত-মরু, সমুদ্র-তরঙ্গ আর লতা-গুল্ম সবুজ বৃক্ষ ও মহিরুহ,
দিবস-রজনিব্যাপী সবারই নিশ্বাসে বিশ্বাসে রয় জাগিয়া তোমার রুহ।
মুহম্মদ মানেই সত্য, সত্য মানেই আল্লাহ আমাদের প্রত্যয়,
অভেদ, মানব তত্ত্ব, সাম্যে নিরত্যয় ইসলাম চির সত্য ও নির্ভর।
হযরত আবুবকর-ওমর-ওসমান আলীর খেলাফতি সাম্যবাদ
মানব-মানবীর মুক্তির লাগি কর্ষণ করি বিশ্বব্যাপী ইসলামি ক্ষেত্র আবাদ।
ইসলামের অভ্যুদয়ে দুনিয়াব্যাপী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শীর্ষোন্নত সেসব মুসলমান
এখন কেবল ইতিহাস নয়, নক্ষত্রের মতো প্রোজ্জ্বল-দিশা সংস্কার মুক্ত জ্ঞান।
অগ্রদূত হে হযরত মুহম্মদ, তুমি মুক্ত করেছ কুসংস্কার যত, কুশিক্ষা যত ছিল
এই দুনিয়ায়;
মানুষের মুক্তি আর সম-অধিকারে গরিব-আমির সব একাকার সাম্য প্রতিষ্ঠায়।
মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আমাদের সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক,
প্রাণপ্রিয় হে হযরত মুহম্মদ, তোমার সে দিক নির্দেশনা আমরা
পেয়েছি কি ঠিক?
তুমি যে জ্বালায়েছ আলো দূর অতীতে আরব মরুতে হে সাম্যবাদী বন্ধু মানবের;
তোমারই পথ দিশা বিস্মৃত হবার নয়, আমরা সে পথে যেন চলাফেরা করি ঢের।
রিপুর কুটিল তাড়না সব দমিত হোক আজ, লোভ আর লালসার হোক লয়;
কখনো হয়নি জানি তোমার সংযমী চরিত্রে অমোঘ সত্যের পরাজয়।
তুমি মানব-মানবীর চির বন্ধু, চির স্বপ্ন, চির সত্যের হে প্রিয় দিশারি,
আল্লাহর নামে জীবনের দামে তোমারে স্মরিয়া আমরাও যেন তোমারই পথে
মানুষ হয়ে মানুষেরে ভালোবেসে যেতে পারি।
তুমি চির মহান, তুমি চির সুন্দর, পরম পবিত্র হে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম,
সমগ্র জীবনব্যাপী তোমাকে স্মরণ করে ন্যায়ের রশি ধরে জপে যাই
বিশ্ব প্রভু মহামহিম আল্লাহর নাম।

জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি

লিলি হক

মনে পড়ে সেই গনগনে তপ্ত রাজপথ
মিছিল-মিটিং দুর্বার আয়োজন,
স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে
অগণিত জনতার দৃঢ় প্রত্যয়
মৃত্যুর ভয়ে এতটুকু ভীত নয়।
রক্তস্রোতে লাল হয়েছে বাংলার সবুজ ঘাস,
বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যার পানি।
চোখের সামনে ভেসে ওঠে,
আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে
যাওয়া মগড়া নদীর দৃশ্য।
কোনো লাশ হাত বাঁধা, কোনোটা
পেট ফুলে আছে বীভৎস চেহারা নিয়ে।
স্মৃতির অ্যালবামে ভাসছে দৃশ্যগুলো,
ঝুপ করে পড়া লাশের শব্দ
মগড়ার পুলের উপর থেকে।
সারাদিন ধরে যাদের হানাদার
বাহিনীর বর্বর পশুরা ধরতো
সন্ধ্যায় সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে
গুলি করে ফেলে দিত মগড়ার গর্ভে,
হাঁপিয়ে উঠতাম স্বজনহারাদের চিৎকারে।
বিধবা স্ত্রী-সন্তানহারা মা,
উহ্ কী বেদনাকাতর স্মৃতি!
তাই ভাবি এত রক্তের প্রতিদানে
পাওয়া স্বাধীনতা আমাদের নতুন
প্রজন্মের জন্য কীভাবে রক্ষা করছি,
কী করে আমরা স্বাধীনতার
সুফল ভোগ করব?
আমরা কি জেগে আছি,
না ঘুমিয়ে আছি?

স্বপ্ন আমার তোমায় ঘিরে

দেলওয়ার বিন রশিদ

আমার স্বপ্ন আমার আশা সবই তোমাকে ঘিরে
তুমিই তো প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষার উৎস
তুমি নিটোল সবুজ বাগান, বোধের জমিন
নদীর ধারে কাশবন
তুমি সাঁঝের প্রবাহ
মধ্যরাতের জোছনা ধারা
তোমার শিরায় তোমার দেহে
আমার ইচ্ছেরা ঘুমায়
ভোরের সূর্য তোমার করতলে
যেন কাঙ্ক্ষিত সকাল তুমি
তোমার মধ্যে খুঁজে পাই শান্ত দুপুর
ফোটা কুসুমের সৌরভ
তুমিতো আমার উৎসব, আনন্দ কুসুম
বিস্তৃত সবুজজুড়ে তুমি উজ্জ্বল,
তুমিতো জীবনের সৌন্দর্য, ভালোবাসা
তুমিই কল্যাণ
শুচি ও শুভ্রতা প্রত্যহ তোমার মধ্যে দেখি।

মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে মানুষের পাশে

কামাল বারি

আমার বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে
শুচি শুভ্রতায় শুদ্ধ হয়ে–
আমার বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে
বন্যার জলের পলি সম্ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে
মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে মানুষের পাশে;
জীবাণু যুদ্ধের ধকল সয়ে
ঝড় বন্যার ছোবল সয়ে
বড় দুর্যোগের তাণ্ডব সয়ে
মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে মানুষের পাশে;
সুরক্ষায় অটল
সৌহার্দ্যে সুশৃঙ্খল–
প্রতিরোধে অবিচল–
আমার বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে;
আমার বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে–
নতুন পৃথিবীর সুযোগ্য হয়ে।

আহারে নদী... আহারে মেঘ

প্রত্যয় জসীম

গরম চায়ের কাপে চুমুক শেষ
তখনো রয়েছে মিশে উষ্ণতার রেশ
জানতে চেয়েছ চায়ে চুমুক শেষ
এখনোতো শুরুই হলো না তার আগেই শেষ!
আহারে মেঘ... আহারে নদী
তোমরা কোথায় থাকো...
দুর্ভাগা কবিকে তোমাদের বুকে রেখ...।

করোনা

অদ্বৈত মারুত

যেখানে যাই, যেতে চাই গাদাগাদি লোক।
সবটুকু ভূমি, জলভাগ যেন দখলে তার।
নিশ্বাস নেবার মতো নিশ্চিন্তে দাঁড়াবার
মতো এক চিলতে জায়গা নেই কোথাও
গাছগুলো পাতাহীন হয়ে মরে পড়ে থাকে!
ফলে গরম গরম বাতাসের ঢেউয়ে ভাসি
অযাচিত কাশি উঠে আসে বুকে– মুখে
জমতে থাকে সাদা সাদা কুয়াশার দানা
শ্বাসকষ্ট বাড়লে ভাবি, করোনা করোনা!
না, না, আমার চারপাশে সুস্থ মানুষেরা
থাকে। ঘুমায় নাকে তেল দিয়ে, নাকি
জেগে থাকে ঘোড়া– হাঁটে জিরাফের মতো
লম্বা গলা বাড়িয়ে খায়-দায় করোনা ফুল
বাইরে গেলে এসবই দেখি বাজারে, মোড়ে
আমার নিস্তার নাই বিস্তর ঘরে– চৌকাঠে
পা বাড়ালেই আঁকড়ে মনে বসে যায় চেপে
ওপারের গান শোনায় নীল ভাষা বেদনায়
এমন গান গল্পের মতো একশ বছর আগের
বড্ড ভয়ে ভয়ে থাকি পা রাখি চুপচাপ
হলঘরে, বাজারে সবখানে সাপের উত্তাপ!

পৃথিবীর দুঃখ পাঠে
ইমরুল ইউসুফ

উপুড় হয়ে কাঁদছে পৃথিবী
অন্ধ বালিকার মতো
আকাশে মেঘের আগুন আগুন খেলা
পোস্টকার্ডে লেখা হয় পাথর যুগের ইতিহাস।
পথে পথে আঁকা সূর্যের ছবি
ল্যাংটো বালক মার্বেল চুম্বনে মাপে–
আঙুলের দূরত্ব আর নিস্তব্ধ দুপুরের ইলাস্ট্রেশন
ভাবনা খেয়ায় ভেসে থাকে অপেক্ষার দীর্ঘশ্বাস।
খেই হারানো বিকেল বামন সন্ধ্যার খোঁজে একা
পাখির ডানায় রাতের স্তব্ধতা
তারা থেকে খসে পড়ে পোস্টকার্ডের আলো
পৃথিবীর দুঃখ পাঠে কাঁদে জলপরি।

এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
রুস্তম আলী

আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ
এ জগতে এটাই পরিচয়
কেহ কালো, কেহ বা সাদা
নহে ব্যবধান
রক্ত সবার লাল।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
সবার একই প্রাণ
হাসি, কান্না, মায়া, মমতায়
সবাই সমান।
প্রেম-ভালোবাসায় আশা-নিরাশায়
ব্যবধান নাই কারো কথায়
আমরা সবাই মানুষ
এটাই সত্যি কথা।
বলনে-কথনে, হাঁটনে-চলনে
ইশারায়-ইঙ্গিতে বুঝাতে হবে
এ ধরা মাঝে–
নাই কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ।
জ্বালিয়ে যাব আলোর প্রদীপ
বিশ্বমানবতা অবাক হবে দেখে।
আমরা মানুষ–
সুন্দর আমাদের মন
মানুষে মানুষে নাই ব্যবধান
এক বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান।

জাগো
এস এম তিতুমীর

মেঘ উড়ে যায়। ডানায় জলরাশি
ছায়ার তলে চলে বৃক্ষের আনাগোনা
উদ্যত কচি পাতার চোখে জেগে ওঠে
শত জনমের সবুজ।
ভিজে যায় অনাদিকালে আহ্বানে
ভালোবেসে ঘর ছাড়া জোনাকি যুগল
আঁধার সরাবে বলে
বন থেকে বনে, বনান্তরে
প্রান্তরে প্রান্তরে সে কী চঞ্চলতা।
বহতা বিস্তর ঘনিষ্ঠতার অন্তরে
অপরূপ রূপময়তা
আঁধারে আলোর সরলতা
ঠিক বহতা নদীর বাণিজ্য যাত্রা
এই তো শৃঙ্খল ভাঙা প্রতিবাদী ওই চোখ
মোহময়তার জাল ছিন্ন করে পাশে এসে দাঁড়ালে
এখনই সময়
আলো গিলে নেওয়া মননের সামনে
চোখ তুলে তাকাবার
নিজেকে হাঁকাবার
ভালোবাসার দিকে।
ভূমি পল্লবের একটি কণাও যেন
না হয় ফিকে।

আমাদের গাঁয়
রকিবুল ইসলাম

তুমি যদি যেতে চাও আমাদের গাঁয়
সবুজের হাতছানি বকুলের ছায়
হেঁটে হেঁটে চলে যাও ছোটো দুটি পায়।
দেখবে সেখানে আছে শিমুলের ফুল
তেলাকুচি, ভাটফুল করবে আকুল
পা দু'খানা ভিজাবে ভরা নদীকূল।
বিকেলের খোলা মাঠে ছেলেদের দল
মিলেমিশে খেলা করে লেবু ফুটবল
আঁধারে জোনাক জ্বলে রূপ ঝলমল।
আরও কিছু দূরে গেলে পাবে শৈশব
হারিয়েছি যেখানে দামি ঐসব
জানি তুমি বলবে– আজ কই সব?
আজও তুমি পাবে সব প্রকৃতির মাঝে
আমরা রয়েছি শুধু কতশত কাজে
এখনো মনের মাঝে সেই সুর বাজে।
আহা সেই দিনগুলো ফিরে পেতে চাই
যেদিকে তাকাই আহা কিছু তার নাই
সাথে নিয়ে সুখস্মৃতি সুখেতে ঘুমাই।

এই সুবাসী সন্ধ্যায়

শাহ্ সোহাগ ফকির

এই দখিনা হাওয়া হয়ে যাবে হীমবাহ
আমন ক্ষেতের আলপথ ধরে,
এই সুবাসী হেমন্তের জ্যোৎস্নায় ভরে।
এই শ্যামল দীঘল মেঘের উড়ন্ত কেশ
হেসে চলে যায় অজানায়,
তীক্ষ্ণ মুখে শিউলির ঝরা হাসি
প্রাত ভোরের বালি জ্যোৎস্নায়।
স্নাত ঘাসের কোলে শিশিরের ঝিলমিলে
দাগ টেনে যাব নরম রৌদ্র রেখা,
এমন গোলাপি ভোর দিয়ে যাবে দেখা।
উনুনের সিদ্ধ ধানের ওমে কৃষানির মুক্ত
হাসি উড়ছে হাওয়া,
আবার দেখা হবে পূর্ণিমার রুপালি জ্যোৎস্নায়
এই সুবাসী– সন্ধ্যায়।

নিয়তির দলিল

নুরুল ইসলাম বাবুল

পৃথিবীতে এ কোন আঁধার?
এ কোন অসুখ নেমেছে আজ মৃত্তিকার ঘাসে;
ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সব
ঘরে ঘরে আটকে যাচ্ছে মানুষের পা;
দুর্ভাগা মানুষ!
নিয়তির দলিলে লেখা তার–
সাড়ে তিনহাত ভূমির মালিক।

করোনার কালো ক্ষত

মুসলিমা খাতুন (শান্তি)

আমরা শিশুরা করোনার আঘাতে
ক্ষতবিক্ষত হতে চাচ্ছি না,
তাই আমরা স্কুল, পার্ক আর
দাদি-নানির বাড়িও যাচ্ছি না।
ভালো লাগে না ঘরে থাকতে
মন বসে না ছবি আকঁতে,
কেন এমন হলো–
এর উত্তরটা কেউ বলো?
করোনা শেষ হলেই মোরা স্বাধীন হবো
সুস্থ পরিবেশে,
হাসবো, খেলবো, নাচবো, গাইবো
লাল পরিটার বেশে
আমার স্বপ্ন সত্যি হবে
করোনা একদিন চলেই যাবে
সবাই আবার সবার হবো
সুন্দর একটি জীবন পাব।

বেঁচে থাকার আশা

মো. মাইদুল ইসলাম জনী

রক্তদান এক মহান মানবিক দৃষ্টিকোণ
রক্তক্ষরণ পুরে ছাই করে দেয় মন।
সময়ের তালে তালে, সবকিছু বদলায়,
চাহিদার শেষ নেই, মহাকাল ধমকায়।
অকারণ শিহরণ,
শুধু শুধু চলে রণ।
অবশেষে ভাঙে পণ, মেনে নিয়ে পরাজয়
ঘাড়ে এসে চেপে ধরে জগতের শত ভয়।
কতবার মিছিলে বলেছি, এঁকেছি আলপনায়,
রক্তের বন্যায়, ভেঙে যাক অন্যায়
সাহসী ছিলাম, সেটা ছিল প্রতিবাদের ভাষা
এভাবেই খুঁজে পাই বেঁচে থাকার আশা।

বাবা

নীলিমা নিশাত রিমি

বাবা তোমাকে খুব মিস করি
জানি তুমি চলে গেছ বহু দূরে,
তুমি আর আসবে না ফিরে
তবুও কেন জানি মনে হয় তুমি আছ
কাছে থেকে আমায় খুব ভালোবাস,
আজ অনেক বছর হলো তোমাকে দেখি না
কেউ কি বলতে পারে না তোমার ঠিকানা?
সব সময় থাকতে পাশে শীতলতার চাদরে ঘিরে
মাথায় ছাদ হয়ে তুমিই ছিলে,
তোমার মতো কেউ আমাকে বোঝে না
প্লিজ বাবা আমার কাছে ফিরে এসো
বাবা তোমাকে খুব মিস করি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে ৭ই অক্টোবর ২০২০ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান আপিল বিভাগের বিচারক বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ পেশ করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সমাজের কোনো বোঝা নন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষকে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূতকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। সাদাছড়ি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের চলাচলের জন্য শুধু একটি সহায়ক উপকরণই নয়; এটি তাদের পরিচিতির প্রতীক, স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে পথ চলার সহায়ক শক্তি। ১৫ই অক্টোবর 'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২০' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। প্রতিবন্ধিতা কোনো রোগ নয় উল্লেখ করে বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সমাজের কোনো বোঝা নন। তাদের যথার্থ সেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ প্রদান নিশ্চিত করা গেলে তারাও সমাজের আর দশ জন মানুষের ন্যায় জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। শারীরিক প্রতিবন্ধিতার জন্য কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হন তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামাজিকভাবে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'সাদাছড়ির উন্নতি– দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অগ্রগতি' দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে সবার মাঝে বার্তা ছড়িয়ে দেবে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

শিশুরাই আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায়। এজন্য তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা স্নেহ-মমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব হয়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তিময়। ৫ই অক্টোবর 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং ৫-১১ই অক্টোবর 'শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো উল্লেখ করেন, শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদনের বিকল্প নেই। এগুলো শিশুর অধিকার। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ এ সনদে অনুস্বাক্ষরকারী অন্যতম একটি দেশ। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০', 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১' ও 'শিশু আইন ২০১৩'। এসব কর্মসূচি ও নীতিমালা শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব শিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য– 'শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এর সাথে মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থানসহ নানা উপাদান জড়িত থাকে। তাই আবাসন মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রামকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নগর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার প্রত্যেক গ্রামে শহরের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৫ই অক্টোবর 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই অক্টোবর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাভার সেনানিবাস প্রান্তে সেনাবাহিনীর ১০টি ইউনিট ও সংস্থাকে জাতীয় পতাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পসহ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্মুখে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার,' 'পর্যটন ভবন' এবং রাজধানীর গ্রিনরোডে নবনির্মিত 'পানি ভবনের' উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বিমানবন্দরের কাজ শেষ হলে দেশের বিমানের যাত্রী পরিবহণ পরিসর আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বিমানের সিলেট-লন্ডন সরাসরি ফ্লাইট চালুর আশ্বাস দেন। পানি ভবন উদ্‌বোধকালে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় নতুন জলাধার সৃষ্টি এবং বিদ্যমান জলাধারগুলোতে পানির ধারণক্ষমতা বাড়াতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের মানুষের কাছে সুপেয় পানি পৌঁছে দিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমিয়ে মাটির উপরের পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২০৪১ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ হবে পুরুষের সমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৫তম বার্ষিক অধিবেশনের ফাঁকে 'ফোর্থ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইমেন'-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বৈঠকে তিনটি বিষয় তুলে ধরেন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের সমান হবে বলে জানান।

সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাভার সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১০টি ইউনিট ও সংস্থাকে জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী করোনা প্রাদুর্ভাব আবার বাড়তে পারে এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতে পারে বলে আশঙ্কা করেন। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী অর্থ সাশ্রয়ে এবং সরকারি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সাইডলাইনে 'High Level Meeting on the 25th Anniversary of the Fourth World Conference on Women' শীর্ষক ইভেন্টে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন–পিআইডি

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ দেন। খাদ্য সংকট যাতে দেখা না দেয়, সেলক্ষ্যে দেশে খাদ্য উৎপাদন আরো বাড়ানোর তাগিদ দেন। প্রধানমন্ত্রী দেশ গঠন ও বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ ও অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে একটি প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় পতাকা (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৪ই অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বাঙালি পরিচয় হচ্ছে মুখ্য। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যখন আমরা দেখতে পেলাম ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য করতে গিয়ে আমাদের বাঙালি পরিচয়ের ওপর আঘাত আসছে, বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসছে, বাংলা ভাষার ওপর আঘাত আসছে, তখন সেই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সম্মিলিত রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে নারী নির্যাতনকারীর

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, নারী নির্যাতন-ধর্ষণের সাথে যারাই যুক্ত থাকুক, যে পরিচয়ই ব্যবহার করুক না কেন, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। ৫ই অক্টোবর সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তানিয়া সুলতানা হ্যাপি রচিত *আমি হবো আগামীদিনের শেখ হাসিনা* শিশুতোষ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের অপকর্মের সাথে যারা যুক্ত, তারা দুষ্কৃতিকারী, তাদের কোনো অন্য পরিচয় থাকতে পারে না। এ ধরনের দুষ্কৃতিকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। ইতিপূর্বে এ ধরনের ঘটনায় অনেক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটতো, কিন্তু আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এমন ব্যাপকতা না থাকায় অনেক ঘটনাই আড়ালে থেকেছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এখন বেশির ভাগ ঘটনা আড়ালে থাকে না, প্রায় সব ঘটনাই প্রকাশ্যে আসে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা নারী নির্যাতন-ধর্ষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার, এই বিষয়গুলো যারা তুলে ধরছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। এতে করে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের অপকর্ম যারা ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজতর হচ্ছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে তাঁর অফিস কক্ষে ১৩ই অক্টোবর ২০২০ ভারতের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন। এসময় তথ্যসচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

দেশ ধ্বংসের অপচেষ্টা করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, যেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে সবার রক্তস্রোতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সেটা ধ্বংসের অপচেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্রকে উলটো পথে হাঁটানোর চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘ ২১ বছর রাষ্ট্র উলটো পথে হেঁটেছে। এরপর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর যে চেতনার ভিত্তিতে রাষ্ট্র রচিত হয়েছে সেই চেতনাগুলোকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। ১০ই অক্টোবর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক দুস্থ ও মন্দিরের অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে এই দেশের অভ্যুদয় হয়েছে। দেশ বিভাগ হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। আমরা দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্র পেয়েছিলাম সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যেখানে ধর্মীয় পরিচয়টাকে মুখ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু আবহমানকাল ধরে লালিত সংস্কৃতি হচ্ছে মুখ্য, আমাদের কাছে ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য নয়। আমাদের কাছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা অক্টোবর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ম্যুরাল' ও 'মুজিব কর্নার', বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নবনির্মিত 'পর্যটন ভবন', বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'পানি ভবন উদ্‌বোধনসহ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নবনির্মিত 'টার্মিনাল ভবন' নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও মুজিব কর্নার উদ্‌বোধন

১লা অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ম্যুরাল' ও 'মুজিব কর্নার', বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নবনির্মিত 'পর্যটন ভবন', বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'পানি ভবন' উদ্‌বোধনসহ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নবনির্মিত 'টার্মিনাল ভবন' নির্মাণের কাজ উদ্‌বোধন করেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২০

২রা অক্টোবর : শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর উদ্যোগে ২রা অক্টোবর দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২০' পালিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে উৎপাদনশীলতা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য– 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা'।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২০ উদ্‌বোধন

৪ঠা অক্টোবর: স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকায় শিশু হাসপাতালে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২০-এর উদ্‌বোধন করেন।

সিলেট-লন্ডন রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট উদ্‌বোধন

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিলেট-লন্ডন রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইটের উদ্‌বোধন করেন।

বিশ্ব শিশু দিবস এবং শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০

৫ই অক্টোবর: ৫ই অক্টোবর 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং ৫-১১ই অক্টোবর পালিত হয় 'শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০'। বিশ্ব শিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে'।

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০

৫ই অক্টোবর 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০' পালিত হয়। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'Housing for all: A better urban future' তথা 'সবার জন্য আবাসন: ভবিষ্যতের উন্নত নগর'।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী-এর ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন

৭ই অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সচিবালয় প্রাঙ্গে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-এর ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন।

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উদ্‌বোধন

৮ই অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জের ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই অক্টোবর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরাল উন্মোচন করেন–পিআইডি

হেলথ মিনিস্টারস ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে হেলথ মিনিস্টারস ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান করেন।

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২০

১৫ই অক্টোবর: এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'সাদাছড়ির উন্নতি– দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অগ্রগতি'।

শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল এয়ার রাইফেল টুর্নামেন্টের উদ্‌বোধন

১৭ই অক্টোবর: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক অনলাইন এয়ার রাইফেল প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল।

শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

১৮ই অক্টোবর : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম ও পাঁচ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড প্রকাশ করেছে। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১৮ই অক্টোবর ঢাকায় তাঁর দপ্তর থেকে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ডাটাকার্ড প্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২০-এর লোগো উন্মোচন

১৯শে অক্টোবর: যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সম্মেলন কক্ষে শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২০-এর লোগো উন্মোচন করেন।

একনেকে এক হাজার ৬৬৮ কোটি টাকার চারটি প্রকল্প অনুমোদন

২০শে অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২০শে অক্টোবর গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এক হাজার ৬৬৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ৪টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন মাত্রায় সম্পর্ক গড়তে চায় চীন

চীন-বাংলাদেশ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং দুই দেশের সম্পর্ক আরো সুসংহত করতে চীন প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি বলেন, যৌথভাবে বহু বিলিয়ন ডলারের বেল্ট অ্যান্ড রোডের নির্মাণ এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার জন্য তার দেশ প্রস্তুত রয়েছে। বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে ৪ঠা অক্টোবর রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে অভিনন্দন বার্তা বিনিময় অনুষ্ঠানে শি জিনপিং এ মন্তব্য করেন।

শি জিনপিং চীন-বাংলাদেশের বন্ধুত্বের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে উন্নয়নের কৌশল আরো সুসংহত করতে এবং চীন-বাংলাদেশ সহযোগী অংশীদারিত্ব আরো এগিয়ে নিতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে কাজ করতে তার দেশ প্রস্তুত রয়েছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, ৪৫ বছর আগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে দুই দেশই একে অপরকে সম্মান জানিয়ে

আসছে। পারস্পরিক রাজনৈতিক বিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করেছে, যা দুই দেশের জন্যই সুস্পষ্ট সুবিধা বয়ে এনেছে। করোনা মহামারিতেও উভয় দেশের একে অপরের সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়া ৪ঠা অক্টোবর চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে অভিনন্দন বার্তা বিনিময় করেন। লি কেকিয়াং তাঁর বার্তায় বলেন, চীন বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো গভীর করতে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থিতিশীল টেকসই করতে আগ্রহী, যার লক্ষ্য উভয় দেশের জনগণের উন্নতি।

বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনে ১০১তম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য জাতিসংঘের সংস্থার নাম ঘোষণা করে।

নোবেল কমিটির মতে, যুদ্ধ ও সংঘাতের অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধার ব্যবহার রোধ করার ক্ষেত্রে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০২০ সালের নোবেল বিজয়ী ডব্লিউএফপি খাদ্য সুরক্ষাকে শান্তির উপকরণ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করেছে এবং যুদ্ধ ও সংঘাতের অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধার ব্যবহারকে মোকাবিলায় জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো একত্রিত করার জন্য জোরালো

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও যুক্তরাষ্ট্রের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান ১৫ই অক্টোবর ২০২০ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষের সভাপতি নির্বাচিত

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট বিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষের (আইএসএ) কাউন্সিলের ২৬তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ৪ঠা অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ১লা অক্টোবর থেকে এটি কার্যকর ধরা হবে বলে জানানো হয়।

আইএসএ ১৯৯৪ সালে সমুদ্রসীমার আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর জামাইকার কিংস্টনে। এ সংস্থা সমগ্র মানবজাতির সুবিধার জন্য সমুদ্রে খনিজসম্পদ সম্পর্কিত সব কার্যক্রম সংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ আইএসএ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে রয়েছে।

শান্তিতে নোবেল পেল বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি

ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার লড়াইয়ে ভূমিকা রাখার জন্য জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বা ডব্লিউএফপি) পেল এবারের শান্তিতে নোবেল। নরওয়ের নোবেল কমিটি ৯ই অক্টোবর অবদান রেখেছে। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান বেরিট রেইস এন্ডারসন শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন।

নোবেল জয়ের খবরের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ডব্লিউএফপি টুইট করে বলেছে, বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন ১০ কোটির বেশি শিশু, নারী ও পুরুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন ডব্লিউএফপি'র কর্মীরা। এই পুরস্কার তাদের কাজের স্বীকৃতি পেল। চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ২১১ ব্যক্তি এবং ১০৭ প্রতিষ্ঠানের নাম জমা পড়েছিল।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু

যাত্রা শুরু হলো বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেসের। পঞ্চগড় রেলস্টেশন

থেকে ১৫ই অক্টোবর ট্রেনটি রাজশাহীর উদ্দেশে ছেড়ে যায়। রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন নতুন এই ট্রেনটি উদ্‌বোধন করেন। ট্রেনটি চালু হওয়ায় এ অঞ্চলের ভ্রমণপিপাসুদের জন্য পঞ্চগড় সীমান্তবর্তী ভারতের কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং ভ্রমণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এসময় রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, ভবিষ্যতে শুধু ভারত নয়, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে আমাদের রেল যোগাযোগ স্থাপন হবে। এতে চারদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনটি এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ছিল। আজ সে দাবি পূরণ হলো। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ট্রেন সার্ভিস চালু হবে বলেও জানান তিনি। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মিহির কান্তি গুহর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মজাহারুল হক প্রধান এমপি, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব সেলিম রেজা, পঞ্চগড় জেলা

প্রশাসক ড. সাবিনা ইয়াসমিন, পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ ইউসুফ আলী ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনোয়ার সাদাত সম্রাট।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মাইলফলক

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (রিজার্ভ) ৪০ বিলিয়ন ডলার বা ৪ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। ৮ই অক্টোবর দিন শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের সঙ্গে রপ্তানি আয় বেড়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জাইকার ৩০ কোটি ডলারের সহযোগিতা। এ কারণে রিজার্ভের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। প্রথমবারের মতো দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। এর আগে ৩রা জুন রিজার্ভ ৩৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। ১লা সেপ্টেম্বর ৩৯ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। করোনা ভাইরাসের কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিম্নগতি থাকলেও প্রবাসী আয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে সহায়তা করেছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে ডিজিটাল বৈষম্য দূর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত দ্বীপ, চর ও হাওড়সহ দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার কাজ শুরু হয়েছে। স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি (বিএসসিএল) যথাযথ অবদানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১১ই অক্টোবর রাজধানীতে আয়োজিত এক ওয়েবিনারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাসদর সিগন্যালস পরিদপ্তর ও আইটি পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিএসসিএল তাদের কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করতে সময়োপযোগী এই সমঝোতা চুক্তি করেছে।

চালু হলো 'বাংলা কিউআর'

দেশের সর্ববৃহৎ পেমেন্ট গেটওয়ে এসএসএল কমার্স চালু করল স্পর্শবিহীন পেমেন্ট সিস্টেম 'বাংলা কিউআর'। ১লা অক্টোবর রাজধানীর একটি সুপারশপ ও ফুড চেইন আউটলেটে ক্রেতারা বাংলা কিউআর দিয়ে পেমেন্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্‌বোধন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত দেশের জাতীয় কিউআর হচ্ছে 'বাংলা কিউআর'। এর মাধ্যমে স্মার্টফোন দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করা হয়। এরপর ব্যাংকের অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেতারা ডিজিটালি পেমেন্ট করতে পারবেন। এ লেনদেনে টাকা স্পর্শ করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই এটিকে বলা হচ্ছে স্পর্শবিহীন প্রযুক্তি।

ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড়ো উদ্যোক্তা, রেস্টুরেন্ট, মুদি দোকান বা যে-কোনো ধরনের খুচরা বিক্রেতা এবং নিম্ন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সব রকমের ক্রেতাদের জন্য এ পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রেতারা ক্যাশ অথবা কার্ড স্পর্শ না করে সহজ এবং সুবিধাজনকভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সঙ্গে ঢাকায় ১৪ই অক্টোবর ২০২০ আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত Mustafa Osman Turan দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন–পিআইডি

অনলাইনে শুরু রোবট অলিম্পিয়াড

শিক্ষার্থীদেরকে রোবটিক্সের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২০। ৮ই অক্টোবর অনলাইনে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২০-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে প্রথমবার অংশ নিয়েই স্বর্ণপদক অর্জন, এরপর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আরো বেড়ে যাওয়া দেশের জন্য অনেক সম্মানের। রোবটিক্সকে শিক্ষার্থীদের আরো কাছে নিয়ে যেতে বা হাতেকলমে রোবট নিয়ে দক্ষতা বাড়াতে দেশের তিনশটি স্থানে 'স্কুল অব ফিউচার' ল্যাব তৈরি করা হবে। এবছর জাতীয় পর্বের জন্য দেশের ৬২টি জেলা থেকে ৭৩১ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছে। জাতীয় পর্বে বিজয়ীদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাচাই করা হবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানির পথে বাহারি কবুতর

মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশে এখন কবুতর রপ্তানি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো জর্ডানে কবুতর রপ্তানি হয়েছে। পাশাপাশি আরো দুই দেশ আরব আমিরাত ও বাহরাইনে কবুতরের রপ্তানি প্রক্রিয়া চলছে। ওই দুই দেশের জন্য আড়াই হাজার কবুতরের অর্ডার পাওয়া গেছে। আসছে নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওই দুই দেশে কবুতর পাঠানো হবে। ইতোমধ্যে এ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে কয়েকজন যুবক লাখপতি বনে গেছেন। তারা বলেন, অল্প পুঁজিতে তারা এ আয় করেছেন। দেশে প্রায় ২০ প্রজাতির নানা রঙের কবুতর আছে।

এসব প্রজাতির মধ্যে রয়েছে– গিরিবাজ, বোখারা, ট্রামপিটার, জেকোবিন, লাহোর, কিং, ফ্রিলব্যাক, ওরিয়েন্টাল ফ্রিল, ফ্যানেটেইল, আমেরিকান হেলমেট, আমেরিকান কমোরনান, মোক্ষী, হানগেরিয়ান হাউস পিজিওন, ইংলিশ ট্রামপিটার, আমেরিকান সেইন্ট, স্যাক্রন সোয়ালো, শর্ট ফেস টাঙ্গলার, ওল্ড ডাচ টাম্বলার, পমেরানিয়ান পোউটার প্রভৃতি।

ওল কচু রপ্তানিতে হাজার কোটি টাকার স্বপ্ন

বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা দেশে চাহিদা পূরণ করেও বছরে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ওল কচুর গুঁড়া রপ্তানি করতে পারবে। বর্তমানে যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, সিলেট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলায় ওল কচু উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ অর্গানিক প্রডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, যশোরে গ্রিন জাপান লিমিটেড, পঞ্চগড়ে শামস এন্টারপ্রাইজ এবং কুড়িগ্রামে নর্দান অ্যাগ্রো প্রডাক্টস লিমিটেড ওল কচু প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু করেছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এইচএসসি'র সব শিক্ষার্থী পাস

করোনা ভাইরাসের কারণে এবারের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষা হবে না, সেই ঘোষণা ৭ই অক্টোবর জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তবে পরীক্ষার্থীর ফলাফল কী হবে সেটি ঠিক হবে তার জেএসসি ও এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে। আগামী ডিসেম্বরে এই মূল্যায়নের কাজটি করা হবে। আর এ পরীক্ষায় পাস করানো হবে সকল শিক্ষার্থীকেই।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সরাসরি গ্রহণ না করে ভিন্ন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের এইচএসসি শিক্ষার্থীরা দুটি পাবলিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। এদের জেএসসি ও এসএসসি'র ফলের গড় অনুযায়ী এইচএসসি'র ফল নির্ধারণ করা হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন অনুমোদন

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন করার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৬ই অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠককালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এসসিটিবি)-এর প্রস্তাবে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বিষয়টি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই অক্টোবর ২০২০ গণভবন থেকে শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

নিশ্চিত করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম আল হোসেন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে শুক্র ও শনিবার। এ ছুটি কার্যক্রম চালু হবে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে।

প্রাথমিকে থাকছে না ডাবল শিফট

অবকাঠামো সংকটের কারণে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছিল। এখন থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোনো ডাবল শিফট থাকবে না। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকলেই সিঙ্গেল শিফট করে দেওয়া হবে বিদ্যালয়গুলোতে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম আল হোসেন ৯ই অক্টোবর বলেন, এ বছর সাড়ে ৫ হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিঙ্গেল শিফট চালু করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে এর সংখ্যা আরো বাড়বে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

‘শপআপ’ প্রতিষ্ঠান ১৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ পেয়েছে

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসা সংক্রান্ত যে-কোনো সমস্যা সমাধানে দেশীয় স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান ‘শপআপ’ ১৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ পেয়েছে। দেশীয় স্টার্টআপগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ পাওয়ার রেকর্ড এটি। শপআপে যৌথভাবে এ বিনিয়োগ করেছে ভারতের সেকুইয়া ক্যাপিটাল এবং ফ্লোরিস ভেঞ্চার।

বাংলাদেশে ৪৫ লাখেরও বেশি মুদি দোকান রয়েছে। এত বিশাল সংখ্যক দোকানদাররা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ডিস্ট্রিবিউটর এবং পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে কিনতে গিয়ে নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হন। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায়, তিয়াত্তর শতাংশ মুদি দোকানদার বাকিতে পণ্য বিক্রি করেন কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র সাতাশ শতাংশের লোন পাওয়ার মতো সক্ষমতা রয়েছে। শপআপ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সকল ব্যাবসা প্রক্রিয়া সহজ করে, মালামাল দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং বাকিতে মালামাল ক্রয়সহ ব্যাবসা পরিচালনার পরিপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। শপআপের এসব সহজ সমাধানের ফলে মুদি দোকানদাররা কম পরিশ্রমে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারছেন এবং তাদের ব্যাবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি ও ক্রেতাদের সাথে আরো বেশি ভালো সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগী হতে পারছেন।

দেশের পরিধি পেরিয়ে এবছরের শুরুতে ভারতের বেঙ্গালুরুতে তাদের কার্যক্রম শুরু করে শপআপ। সম্প্রতি ভারতীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘ভূণিক’ শপআপের সাথে একীভূত হয়।

প্রতিবেদন : এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

৪০ আন্ডার ৪০ তালিকায় বাংলাদেশের ন্যান্সি

বিশ্ব প্রযুক্তির রাজধানী হিসেবে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির প্রভাবশালী সাময়িকী *সিলিকন ভ্যালি বিজনেস জার্নাল* প্রকাশিত ফোরটি আন্ডার ফোরটি (৪০ বছরের নিচে ৪০) তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ন্যান্সি হক। ১০ই অক্টোবর মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে এ তথ্য জানা যায়। প্রযুক্তির ব্যাবসা খাতে তরুণ নির্বাহী উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের এ তালিকা প্রতিবছর প্রকাশ করে *সিলিকন ভ্যালি বিজনেস জার্নাল*।

বিশ্বখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাডোবিতে ম্যানেজার অব স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অপারেশনস হিসেবে কাজ করেন ন্যান্সি হক। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, পিডিএফ, প্রিমিয়ারসহ পেশাদার কাজের সফটওয়্যার নির্মাতা অ্যাডোবির ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্সের (ডিক্স) বৈশ্বিক ব্যাবসা পরিচালনাই ন্যান্সির কাজ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ১২ই অক্টোবর ২০২০ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগমের 'রেণু থেকে বঙ্গমাতা' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

প্রকৌশলী, উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া ন্যান্সি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া স্যান ডিয়েগো থেকে তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক, স্যান ডিয়েগো স্টেট ইউনির্ভাসিটি থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ইউসি বার্কলির হ্যাস স্কুল অব বিজনেস থেকে ব্যাবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। ন্যান্সি এর আগেও নানা উদ্যোগের কারণে পেয়েছেন বার্কলি হ্যাস লিডারশিপ স্কলার ২০১৮, জি২০ ইয়াং গ্লোবাল চেঞ্জার অ্যাম্বাসেডার ২০২০, লিডারশিপ ক্যালিফোর্নিয়া ২০২০ পুরস্কার।

সাহিত্যে নোবেল পেলেন লুইস গ্লাক

সাহিত্যে এবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন কবি লুইস গ্লাক। ৮ই অক্টোবর সুইডিশ একাডেমি এ পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছে, লুইস গ্লাকের নিরাভরণ সৌন্দর্যের অভ্রান্ত কাব্যকণ্ঠ ব্যক্তির অস্তিত্বকে সার্বজনীন করে তোলে।

সুইডিশ একাডেমি আরো বলেছে, লুইস গ্লাকের ২০০৬ সালের সংকলন *অ্যাভারনো* ছিল সুনিপুণ এক সৃষ্টিকর্ম, যেখানে

পৌরাণিক চরিত্রগুলোর ভেতর দিয়ে মানবপ্রকৃতির এক দূরদর্শী ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি। বিচারকমণ্ডলী বলছেন, কবি হিসেবে লুইস প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছেন। কবিতায় বার বার নতুন নতুন রদবদল ঘটেছে তার।

৭৭ বছর বয়সি লুইস গ্লাক ১৯৬৮ সালে প্রথম বই *ফার্স্টবর্ন* দিয়ে কবি হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। পেশাজীবনে শিক্ষক লুইস ১৯৯৩ সালে *দ্য ওয়াইল্ড আরিস* কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন পুলিৎজার পুরস্কার, ২০১৪ সালে *ফেইথফুল অ্যান্ড ভার্চুয়াস নাইট* কাব্য সংকলনের জন্য পান ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড।

প্রথমবার একসঙ্গে দুই নারী পেলেন রসায়নে নোবেল

জিন সম্পাদনার কৌশল আবিষ্কার করে রসায়নে এবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইমানুয়েল শারপঁসিয়ে ও জেনিফার এ ডাউডনা। এবারই প্রথম দুই নারী এক সঙ্গে পেলেন এই পুরস্কার। এর আগে পাঁচজন নারী রসায়নে নোবেল পেলেও তারা পুরুষদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছিলেন সে পুরস্কার। ৭ই অক্টোবর ঘোষিত হয়েছে এ পুরস্কার।

৫১ বছর বয়সি ফরাসি অণুজীব বিজ্ঞানী ইমানুয়েল শারপঁসিয়ে বর্তমানে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইউনিট ফর দ্য সায়েন্স অব প্যাথোজেনসে কাজ করছেন। আর ৫৬ বছর বয়সি যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী জেনিফার এ ডাউডনা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

নোবেল পুরস্কারের বিচারকরা বলছেন, জিন সম্পাদনার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল আবিষ্কার করেছেন তারা। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষকরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যে-কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের বংশগতির ধারক ডিএনএ পরিবর্তন করতে পারেন। জীববিজ্ঞানে এ প্রযুক্তির প্রভাব 'বৈপ্লবিক' বলে অভিহিত করেছেন বিচারকরা।

কারখানা সচল রাখতে নারী কর্মীর সুস্থতা জরুরি

দেশের পোশাক শিল্পকারখানার বেশির ভাগ কর্মীই নারী। তাই কারখানার উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে নারী কর্মীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসহ শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করা জরুরি। ৮ই অক্টোবর নেদারল্যান্ডভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা এসএনভি বাংলাদেশের আয়োজনে 'পোশাক শিল্পে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা' শিরোনামে এক ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। আলোচনায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক বলেন, পোশাক শিল্পকারখানার নারী কর্মীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে সরকার ৩৫৪টি কারখানায় বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী দিচ্ছে। করোনাকালে মালিক পক্ষকেও কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ওষুধ সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৭শে অক্টোবর ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনলাইনের মাধ্যমে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মাশরুম চাষের সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের প্রথম হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম উদ্‌বোধন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার ভরাশঙ্কে দেশের প্রথম হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম উদ্‌বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। ১১ই অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে এ ড্যামের উদ্‌বোধন করেন তিনি। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ধরে রেখে কীভাবে সেচ কাজে বা ফসল আবাদে ব্যবহার করা যায় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। সেজন্য পাইলট ভিত্তিতে দেশের প্রথম এই হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। বোরো ধান চাষসহ সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে দেশে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। সেজন্য ভূ-উপরিস্থ পানি ধরে রেখে সেচ কাজে ব্যবহার করার জন্য সারা দেশে এরকম আরো হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ, কৃষির কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ২৫ বছর পূর্বেই কৃষক বাঁচাও আন্দোলন করেছিলেন। আজ তাঁর নেতৃত্বেই কৃষিবিপ্লব ঘটিয়ে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধির হার অনেক ভালো এবং এই ভালো প্রবৃদ্ধির হারে সবচেয়ে বেশি অবদান কৃষির।

ড্যামটি নির্মাণের ফলে আনোয়ারা উপজেলার বরুমচড়া, বারখাইন, হাইলদর, বটতলী, চাতুরী ও আনোয়ারা ইউনিয়নের প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ হয়েছে, যেখানে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন এবং এর বাজার মূল্য প্রায় ২৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা। তাছাড়া শুকনো মৌসুমে (জানুয়ারি থেকে মে মাসে) জোয়ারের সাথে আগত লোনা পানির প্রভাব থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকার ফসল ও গাছপালা রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং আনোয়ারা উপজেলায় কৃষি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কাজুবাদাম ও কফি চাষে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে

কাজুবাদাম, কফিসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, কফি, কাজুবাদামসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে ও প্রক্রিয়াজাতে কৃষক ও উদ্যোক্তাসহ যারা এগিয়ে আসবেন তাদেরকে উন্নত জাতের চারা সরবরাহ, উৎপাদনে পরামর্শ, কারিগরি ও প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। ৪ঠা অক্টোবর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে নীলফামারীতে অবস্থিত 'জ্যাকপট কাজুবাদাম ইন্ড্রাস্ট্রি'র প্রসেসিং ইউনিট ২-এর উদ্‌বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদণ্ডের গেজেট প্রকাশ

ধর্ষণ মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের যে খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে, তা গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে সরকার। ১৩ই অক্টোবর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা থেকে এ গেজেট প্রকাশ হয়েছে। এর আগে সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অধ্যাদেশে সই করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। আইনের ধারা ৯-এর (১) ধারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের পরিবর্তে সশ্রম কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।

বর্তমানে সংসদের অধিবেশন না থাকায় এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করলেন। পরবর্তীতে নিয়ম অনুযায়ী সংসদ অধিবেশন শুরু হলে এটি আইন আকারে পাস করা হবে। ১২ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনি যাচাই (ভেটিং) সাপেক্ষে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন এবং সচিবালয় থেকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা যুক্ত ছিলেন।

আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার পাশাপাশি আরো দুটি সংশোধনী আনা হয়েছে। একটি হলো যৌতুকের ঘটনায় মারধরের ক্ষেত্রে সাধারণ জখম হলে তা আপোশযোগ্য হবে। অন্যটি, এই আইনের 'চিলড্রেন অ্যাক্ট ১৯৭৪'-এর পরিবর্তে 'শিশু আইন ২০১৩'-তে প্রতিস্থাপিত হবে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই অক্টোবর গণভবন থেকে 'Climate Vulnerable Forum (CVF) Leaders' শীর্ষক ভার্চুয়াল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বাঁচাতে ১০০ বিলিয়ন ডলার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাঁচাতে বছরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। ৭ই অক্টোবর 'মিডনাইট সার্ভাইভাল ডেডলাইন ফর দ্য ক্লাইমেট' শীর্ষক ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) ভার্চুয়াল সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান।

সম্মেলনে চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। তিন বলেন, সরকার জনগণের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য 'জাতীয় মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' নামে একটি নতুন কর্মসূচি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের এও নিশ্চিত করা উচিত যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রশমন, অভিযোজন এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধারের জন্য বছরে অন্তত ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেন পেতে পারে।

প্রথম প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্যারিস চুক্তির কঠোর বাস্তবায়নই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির বর্তমান হারকে হ্রাস করার একমাত্র উপায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেন, প্যারিস চুক্তির আওতায় সরকারগুলোকে তাদের জাতীয় অবদানকেই কেবল সম্মান জানানো উচিত নয়, তাদের আকাঙ্ক্ষাও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো দরকার। জলবায়ু ন্যায়বিচারের ধারণাটি জলবায়ু এবং পৃথিবীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তৃতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন, প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি এমডিবি এবং আইএফআইসহ প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোকে (উন্নত দেশগুলো) অর্থের আরো জোরদার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চতুর্থ প্রস্তাবে তিনি বলেন, লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে এবং মূলধারায় আনতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব আমাদের সভ্যতার ক্ষতি করছে, আমাদের গ্রহকে ধ্বংস করছে এবং আমাদের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ফেলেছে। আমরা সিভিএফ নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের অংশীদারগণকে ২০২০ সালের এনডিসি বর্ধিত সময়সীমার আগে জলবায়ুর জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় ত্বরিত এবং শক্তিশালী বৈশ্বিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি। বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত ফোরামের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হয়ে সম্মানিত হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, সিভিএফ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের ১ বিলিয়নেরও বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে অনুল্লেখযোগ্য অবদানের পরেও সিভিএফ দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, সভাপতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে, অর্থায়ন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার আখ্যানগুলো এবং ক্ষয়ক্ষতির ইস্যু তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে জাতিসংঘে বিশেষ 'র‍্যাপোটিয়ার' নিয়োগ এবং একটি সিভিএফ এবং ভি২০ যৌথ মাল্টি-ডোনার তহবিল গঠনের ওপর গুরুত্ব দেব।

বাংলাদেশ গত ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার গ্লোবাল সেন্টার ফর অ্যাডাপটেশনের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয় খুলেছে। এটি বাংলাদেশের সভাপতির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে এবং এই অঞ্চলে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে দক্ষিণ এশিয়ায় যথাযথ পদক্ষেপে সহায়তা, সাহায্য এবং বিকাশ ঘটাবে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আমরা জলবায়ু সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রশমন ও অভিযোজনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমার সরকার ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অধীনে নিজস্ব সম্পদ থেকে ৪৩০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। সারা বছর দেশজুড়ে লাখ লাখ গাছের চারা রোপণ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা লবণাক্ততা, বন্যা এবং খরা প্রতিরোধী ফসল এবং ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। আমার সরকার অভিযোজনমূলক কাজের জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর গড়ে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জিডিপি'র ১ শতাংশ ব্যয় করছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছেছে বিদ্যুতের আলো

দেশে ৯৮ ভাগ মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। দুর্গম চর বা পাহাড়ি জনপদে পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো। এতে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে। ঘটছে কৃষির সম্প্রসারণ। ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে মানুষ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, খুব দ্রুতই এই পরিবর্তন চোখে পড়ছে। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রভাব রয়েছে।

শরীয়তপুরের নড়িয়ার নওপাড়া ইউনিয়নের প্রমত্তা পদ্মার বুকে অর্ধশতাব্দী আগে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে এখানে সাবমেরিন ক্যাবলে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। গত সাত মাসে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর মধ্যেই দুর্গম এই চরের মানুষের জীবনে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) বলছে, সারা দেশে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি সফলভাবেই করেছে তারা। সরকার প্রত্যেকটি গ্রামে শহরের সেবা সম্প্রসারণ করে চলেছে। আরইবি বলছে, ইতোমধ্যে তারা ৮৪ হাজার ৮০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ শেষ করতে চায় তারা। আরইবি'র এখন সন্ধ্যাকালীন সর্বোচ্চ চাহিদার সময় সাত হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।

গ্রামীণ জনপদে কৃষি এবং শিল্পে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। আগে কৃষি সেচের জন্য ডিজেল নির্ভরতা থাকলেও এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়াতে উল্লেখযোগ্য হারে সেচ সংখ্যা বেড়েছে। হিসাব বলছে, ২০০৯-এ যেখানে সারা দেশে সেচ সংযোগ ছিল দুই লাখ ৩৪ হাজার সেখানে এখন সেচের গ্রাহক এক লাখ ২৮ হাজার বেড়ে তিন লাখ ৬২ হাজার। প্রবৃদ্ধি ৫৬ ভাগের উপরে। এর বাইরে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে ২৯২ কিলোওয়াট।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

যানবাহনের ফিটনেস নবায়নে অনলাইন পদ্ধতি

যানবাহনের ফিটনেস সনদ নবায়নে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পদ্ধতি চালু করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ। ১৫ই অক্টোবর থেকে এ পদ্ধতিতে ফিটনেস নবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ঢাকার তিনটি মেট্রো সার্কেল– মিরপুর, ইকুরিয়া ও দিয়াবাড়ি থেকে এ সনদ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সারা দেশের সকল বিআরটিএ-এর কার্যালয়ে এ পদ্ধতিতে ফিটনেস সনদ নবায়ন কার্যক্রম চালু করা হবে বলে জানিয়েছে বিআরটিএ।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য বিআরটিএ-এর সার্ভিস পোর্টাল bsp.brta.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রথমে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের জন্য গ্রাহকের নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর দিতে হবে। নিবন্ধনের পর পোর্টালের 'ফিটনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট সময়সূচি' অপশনে ক্লিক করতে হয়। এখানে 'মোটরযান সংযুক্ত করুন' অপশনে গিয়ে যানবাহনের বিস্তারিত তথ্য দিতে হয়।

সময়সূচি অপশনে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত তারিখ এবং কোন সার্কেল থেকে ফিটনেস নবায়ন করবেন, তা সিলেক্ট করতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য দৈনিক চারটি ধাপ ভাগ করা আছে। সকাল ৯টা থেকে ১১টা, ১১টা থেকে ১টা, দুপুর ২টা থেকে ৪টা এবং ৪টা থেকে ৫টা। এ সময় থেকে পছন্দমতো সময় নেওয়া যাবে। সব তথ্য পূরণ করে সাবমিট করলে গ্রাহকের মোবাইলে

এসএমএসের মাধ্যমে তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। যানবাহনের ফিটনেস নবায়নের তারিখের আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়। বিআরটিএ'তে যাওয়ার আগে আয়করসহ যানবাহনের অন্যান্য ফি পরিশোধ করে মানি রিসিট সংগ্রহ করতে হবে। অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কোনো টাকা লাগবে না। নির্ধারিত তারিখে না গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হবে এবং নতুন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে বলে জানিয়েছে বিআরটিএ।

রামুতে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস উদ্‌বোধন

কক্সবাজারের রামুতে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস 'অক্টোবর ২০২০' উপলক্ষে সড়ক মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। ১লা অক্টোবর রামুর ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের হাইটুপী এলাকায় গ্রামীণ সড়ক সংস্কার কাজের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন রামু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল।

জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সড়ক হবে সংস্কার' –এ স্লোগানকে সামনে রেখে এলজিইডি অক্টোবর ২০২০ মাসকে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস হিসেবে পালন করছে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রথম শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৫৪১ জন নন-ক্যাডার

৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার নন-ক্যাডার থেকে প্রথম শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৫৪১ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ২০শে অক্টোবর সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩৮তম বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কমিশনের ১১তম সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৫৪১ জনকে সরকারের বিভিন্ন দফতর-সংস্থায় নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এরমধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের সমাজসেবা কর্মকর্তা/সমমান পদে ১১১ জন, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ৬২ জন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মেডিকেল কর্মকর্তা পদে ৩৩ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও

উচ্চশিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী পদে ৮৫ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা বিভাগের ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক পদে ১৯ জনসহ ৫৩ ক্যাটাগরিতে মোট ৫৪১টি পদের জন্য সুপারিশ করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া বৈঠক

বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী দাতুক সেরি এম সারাভানানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই অক্টোবর জুম অনলাইন মিটিংয়ে দুই দেশের মন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্তকরণ, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনলাইন সিস্টেম চালু করা, কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্টের সম্পৃক্ততা, পরবর্তী জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভা আয়োজন এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আটকে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের মালয়েশিয়ায় প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

বছর শেষের আগেই আসছে করোনার টিকা

পুরো বিশ্ব যখন করোনার একটি নিরাপদ ও কার্যকর টিকার জন্য অপেক্ষা করছে, যখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, তখনই এমন প্রেক্ষাপটে আশার কথা শুনিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস। তিনি বলছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ করোনা প্রতিরোধী টিকা পাওয়া যাবে। ৬ই অক্টোবর তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ১০ই অক্টোবর পালিত হয়েছে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য: অধিক বিনিয়োগ অবাধ সুযোগ'।

এ বিষয়ে মিডিয়ার সঙ্গে আলাপকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, মানসিক চাপ দূর করতে আমরা কাজ করছি। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অসংক্রামক রোগনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় পৃথক উপকমিটি গঠন করেছি, হেল্পলাইন চালু করেছি, টেলিমেডিসিন সেবা দিচ্ছি। ঘরে আটকানো অবস্থায় থাকলে চাপ বাড়ে, বিষণ্নতা দেখা দেয়। তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে উৎসাহী করছি।

মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে মিডিয়ার সঙ্গে ভার্চুয়াল আলোচনায় চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, করোনাকালে মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। সাত ধরনের মানসিক রোগী বেশি আসছেন। করোনায় সংক্রমিত হবেন–এ নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ, করোনায় আক্রান্তের পর সুস্থ হয়ে ওঠার পরও মানসিক অবসাদ, আবারো করোনা হতে পারে–এ নিয়ে ভয়, করোনা সংক্রমিত হয়ে যারা ভর্তি আছেন তাদের অতিরিক্ত ভয়, শিশু-কিশোরদের দীর্ঘদিন সামাজিক দূরত্বে থাকার ফলে বিষণ্নতা এবং চাকরি হারানো ও বেতন কমে যাওয়ার চাপ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার ২০১৯ প্রদান

সারা দেশের উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত ৫০টি হাসপাতালকে সেরা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়েছে 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার ২০১৯'। ৮ই

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ৮ই অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে Health Minister's National Award-2019 প্রদান করেন–পিআইডি

অক্টোবর রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর নির্মাণ শুরু

চীন থেকে সরাসরি বড়ো কন্টেইনার জাহাজ মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে এসে থামবে ২০২৬ সালে। এমনই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। তবে এর আগেই ২০২২ সালের আগস্টের মধ্যে একটি কয়লা টার্মিনালও নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। মোট ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যেই শুরু হওয়া সরকারের এই প্রকল্পের নির্মাণকাজে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থের জোগান দেবে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকা, আর নিজস্ব তহবিল থেকে চার হাজার কোটি টাকার জোগান দেবে সরকার এবং তিন হাজার কোটি টাকা দেবে বন্দর কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে সরকার গভীর সমুদ্রে একটি বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা করে আসছিল। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে মহেশখালীর সোনাদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পও গ্রহণ করে।

সে সময় ২৫ বছরে ৫৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দরের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল– সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর হলে ২০২০ সাল নাগাদ

সেখানে চট্টগ্রাম বন্দরের তুলনায় ৭৪ গুণ বেশি কন্টেইনার ওঠানামা করতে পারবে। এই লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২রা জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন'-এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের আগস্টে সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দরের প্রস্তাবিত এলাকার মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি এলাকায় ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একটি জেটি নির্মাণ করতে গিয়েই সমীক্ষায় ধরা পড়ে যে, এই স্থান গভীর সমুদ্রবন্দর করার উপযোগী। এ থেকেই প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা মাথায় আসে। চলতি বছরের ১০ই মার্চ মাতারবাড়িতে ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প একনেকের অনুমোদন পায়। সরকার সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, যেহেতু সোনাদিয়ার নিকটেই মাতারবাড়িতে একটি সমুদ্রবন্দর হচ্ছে সেক্ষেত্রে আর কোনো সমুদ্রবন্দরের প্রয়োজন নেই। তাই সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর বিনির্মাণের প্রকল্পটি বাতিল করা হয়। চলতি ২০২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল বৈঠকে আট বছর আগের নেওয়া সেই সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। ওই দিন মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন,'সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর করার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সোনাদিয়ায় আর কোনো সমুদ্রবন্দর হবে না। যেহেতু সোনাদিয়ার খুব কাছাকাছি মাতারবাড়িতে একটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণ চলছে। সরকারের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, সোনাদিয়ায় যদি সমুদ্রবন্দর হয় তবে আমাদের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অনেক ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হবে। এটা যখন স্টাডিতে ধরা পড়ল, তখন সরকার সিদ্ধান্ত নিল সোনাদিয়ায় প্রকৃতির ক্ষতি করে সমুদ্রবন্দর করার দরকার নেই। তাই দীর্ঘ সময় করোনা জটিলতার কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে গেলে তা আবার শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ফিল্ম মিউজিয়াম উদ্‌বোধন

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক ও বৃহৎ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে এই দৃষ্টিনন্দন ভবনটি নির্মিত হয়েছে। আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনে ১৪ই অক্টোবর তথ্যসচিব কামরুন নাহার ফিল্ম মিউজিয়াম উদ্‌বোধন করেন। ফিল্ম মিউজিয়ামটিকে আরো সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক এবং দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্রবোদ্ধাগণ এই মিউজিয়ামের মাধ্যমে উপকৃত হবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন তথ্য সচিব।

তথ্যসচিব কামরুন নাহার ১৪ই অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম মিউজিয়াম উদ্‌বোধন শেষে পরিদর্শন করেন–পিআইডি

এ ফিল্ম মিউজিয়ামের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিকাশে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত নানা ধরনের ক্যামেরা, এডিটিং মেশিন, ফিল্ম জয়েনার, সিক্রোনাইজার, পোস্টার, ফটোসেট, ফটো অ্যালবাম, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার রেপ্লিকা, বাচসাস পুরস্কার রেপ্লিকা, ফিল্ম ব্লক, শ্যুটিং-এর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য, কস্টিউম, শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট, ৭০ মিমি. ফিল্ম ইত্যাদি এ মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এ মিউজিয়ামে বেশকিছু যন্ত্রপাতি প্রদান করে।

মস্কো উৎসবে চলচ্চিত্র *মায়ার জঞ্জাল*

প্রযোজক জসীম আহমেদের চলচ্চিত্র *মায়ার জঞ্জাল*। এ চলচ্চিত্রটি বিশ্বের মর্যাদাসম্পন্ন মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় এ চলচ্চিত্রটি অফিসিয়ালভাবে নির্বাচিত হয়েছে। উৎসবের ফিল্মস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বিভাগে থাকছে ছবিটি। ১লা অক্টোবর শুরু হয় এ উৎসবের ৪২তম আসর। ৬ই অক্টোবর ও ৮ই অক্টোবর উৎসবের সমাপনী দিনে দেখানো হয় *মায়ার জঞ্জাল*। চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের (এফআইপি) এ গ্রেডের তালিকাভুক্ত মস্কো উৎসব। সরকার ও শহরটির সংস্কৃতি বিভাগ এতে সহায়তা করে। এর আগে চীনের মর্যাদাসম্পন্ন সাংহাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এশিয়ান নিউ ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ডের অফিসিয়াল সিলেকশনে জায়গা পায় চলচ্চিত্রটি। এ ছবিতে অভিনয় করেন অপি করিম।

শর্তসাপেক্ষে খুলছে সিনেমা হল

১৬ই অক্টোবর থেকে শর্তসাপেক্ষে সিনেমা হল খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। ১৫ই অক্টোবর তথ্য উপসচিব সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কোভিড-১৯-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সিনেমা হলের আসন সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক আসন খালি রাখা শর্তসাপেক্ষে দেশের হলগুলোতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

এস এম সুলতানের প্রয়াণ দিবস

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ২৬তম প্রয়াণ দিবস নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ১০ই অক্টোবর নড়াইলের জেলা প্রশাসন ও এস এম সুলতান

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২৭শে অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে 'করোনার বিরুদ্ধে শিল্প' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চিত্রা পাড়ে মাছিমাদিয়া গ্রামে সুলতান কমপ্লেক্সে কোরানখানি, দোয়া মাহফিল, পুষ্পমাল্য অর্পণ, জিয়ারত, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আরা, সুলতান ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মিকু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. ইয়ারুল ইসলামসহ আরো অনেক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ।

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার

চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার ২০২০-এ ভূষিত হয়েছেন চিত্রনায়ক আলমগীর হোসেন। ২৬শে অক্টোবর ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চ্যানেল আই স্টুডিওতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার ২০২০ দেওয়া হয়। চিত্রনায়ক আলমগীর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অভিনয় ও পরিচালনা দুটোতেই অবদান রেখেছেন। প্রয়াত ফজলুল হক স্মরণে ২০০৪ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন।

সাংস্কৃতিক জোটের ভয়কে জয় করার নাট্যোৎসব

'ভয়কে জয় করে নাটক' স্লোগানে দনিয়া সাংস্কৃতিক জোট ৯ই অক্টোবর শুরু করে দুই দিনের নাট্যোৎসব। উৎসবে ৮টি নাট্যদল তাদের ৮টি নাটক মঞ্চায়ন করে। দনিয়া স্টুডিও থিয়েটার হলে এ উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। উদ্‌বোধনী আনুষ্ঠানিকতায় উপস্থিত ছিলেন শারদীয় নাট্যোৎসবের প্রবক্তা চিত্তরঞ্জন দাস, বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ গিয়াস, মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়ের সভাপতি মীর জাহিদ হাসান। সন্ধ্যায় মঞ্চায়ন হয় মহাকাল নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত নাটক 'শ্রাবণ ট্র্যাজেডি'র অংশবিশেষ। একই মঞ্চে আরো মঞ্চায়িত হয় শৌখিন থিয়েটারের নাটক 'প্রভাত ফিরে এসো', মৈত্রী থিয়েটারের 'চা অথবা কফি' এবং সায়াহ্নিকা থিয়েটারের 'বসন্তের কুটুম'–এর অংশবিশেষ। বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনার বিষয়টি মাথায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে আসন রেখে এ উৎসবের আয়োজন করে দনিয়া সাংস্কৃতিক জোট।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

আট মাসে বিজিবি'র অভিযানে ৩৭২ কোটি ৯ লাখ টাকার মালামাল জব্দ

গত আট মাসে সীমান্ত এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঁচ লক্ষাধিক অভিযান চালিয়ে ৩৭২ কোটি ৯ লাখ ৫৯ হাজার টাকার বিভিন্ন চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ৭ই অক্টোবর বিজিবি সদর দপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে পাঁচ লক্ষাধিক অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ৬৭ লাখ ৫৮ হাজার ৬১ পিস ইয়াবা, তিন লাখ এক হাজার ৮৩০ বোতল ফেনসিডিল, ৫০ হাজার ৭৯০ বোতল বিদেশি মদ, পাঁচ হাজার ৯৫৮ ক্যান বিয়ার, ৮ হাজার ৮৯৭ কেজি গাঁজা, ১৪.৩২ কেজি হেরোইন, ৩০ হাজার ৫৯৭টি উত্তেজক ইনজেকশন, ৪৬ হাজার ২১৯টি সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ১৭ লাখ ৬৩ হাজার ৮৪৫টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

এছাড়াও সীমান্তে বিজিবি'র অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই হাজার ৬৩ জন চোরাকারবারিকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৩৪৪ জন বাংলাদেশি নাগরিক ও ৯৬ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার

মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। পুলিশ মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ, র‍্যাব মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন ও ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলামসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব ইউনিট এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সারা দেশে মাদক-বিরোধী সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে মাদকাসক্তদের চিহ্নিত করার কাজ অব্যাহত আছে। শুধু ঢাকা মহানগরীতেই ৪৮ জন মাদকাসক্ত পুলিশ শনাক্ত হয়েছে। তাদের চাকরিচ্যুত করার প্রক্রিয়া চলছে।

ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। পুরো ঢাকায় মাদক-বিরোধী বিশেষ সাঁড়াশি অভিযান চালানোর নির্দেশনা জারি করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, মাদকসেবী বা মাদকাসক্ত বা

মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের শনাক্ত করতে বিশেষ গোয়েন্দা টিম কাজ করছে। থানাভিত্তিক মাদকাসক্ত পুলিশ, মাদকসেবী ও মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের তালিকা তৈরির কাজ অব্যাহত আছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব শিশু দিবস পালিত

প্রতিবছরের মতো এ বছরও অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব শিশু দিবস'। একই সঙ্গে ৫ই অক্টোবর থেকে ১১ই অক্টোবর উদ্‌যাপিত হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ। এছাড়া ৬ই অক্টোবর উদ্‌যাপন করা হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌বোধন করেন। বিশ্ব শিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য–'শিশুর সঙ্গে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে'। ৬ই অক্টোবর জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল–আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার'।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষে প্রকাশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি বই, শিশু গ্রন্থমালা, শিশুদের নির্বাচিত লেখা নিয়ে *আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব* ও শিশুদের নির্বাচিত আঁকা ছবি নিয়ে *আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব* বইয়ে মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রী উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বলেন, তাঁর সরকার শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যে-কোনো ধরনের শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, আমরা চাই আমাদের শিশুরা নিরাপদ থাকবে, সুন্দরভাবে বাঁচবে এবং মানুষের মতো মানুষ হবে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

গুইমারায় অসহায়, দুস্থ ও কর্মহীনদের ত্রাণ দিল সেনাবাহিনী

সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও গুইমারা রিজিয়নের নির্দেশনায় ১৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি সিন্দুকছড়ি সেনা জোনের সদস্যরা ১লা অক্টোবর প্রত্যন্ত পাহাড়ি পল্লির ঘরে ঘরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে দিয়েছে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী। সিন্দুকছড়ি জোনের উপঅধিনায়ক মেজর রাহাত আহম্মেদের নেতৃত্বে রামগড় উপজেলার মাহবুব নগর এলাকায় কর্মহীন, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে এ ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

মধু পূর্ণিমা উদ্‌যাপন খাগড়াছড়িতে

সারা দেশে ১লা অক্টোবর শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা পালিত হলেও ভিন্নতা পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির বৌদ্ধবিহারগুলোতে। ১লা অক্টোবর সকাল থেকেই খাগড়াছড়ির বৌদ্ধবিহারগুলোতে চলে সমবেত প্রার্থনা। নানা বয়সি নরনারী ও শিশুদের আগমনে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১লা অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহারে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন আয়োজিত 'শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ২০২০' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

উৎসবমুখর হয়ে ওঠে বিহার প্রাঙ্গণগুলো। মধু ও নানান ফুল, ফল দিয়ে বুদ্ধ পূজার পাশাপাশি চলে শীল গ্রহণ।

চন্দ্র গণনার কারণে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর একদিন বাড়ায় এবছর ভিন্নতা বলে জানিয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। সকল অশুভ শক্তি ও করোনা মহামারি যেন পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যায় সে প্রার্থনা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের। ৩০শে অক্টোবর প্রবারণা পূর্ণিমার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভিক্ষু সংঘের তিন মাসব্যাপী বর্ষাব্রত। এরপর থেকে চলবে মাসব্যাপী কঠিন চীবরদানোৎসব।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাগড়াছড়িতে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

খাগড়াছড়িতে সারা দেশের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ঠা অক্টোবর শুরু হয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন। খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার রঞ্চণমণি কার্বারি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৎজরী চৌধুরী। সিভিল সার্জন ডা. নুপুর কান্তি দাশ সভাপতিত্ব করেন। এসময় সিভিল সার্জন জানান, খাগড়াছড়ি জেলার ১ হাজার ১০টি সেন্টারে প্রায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ২৪৩ জন শিশুকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভিটামিন 'এ' প্লাস খাওয়ানো হবে। কেউ যেন বাদ না পড়ে সেজন্য ১০ দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন কার্যক্রম চলমান থাকবে। জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে ৬-১১ মাসের ১৩ হাজার ৫৩৩ জন শিশু ও ১২-৫৯ মাসের ৮৯ হাজার ৭১০ জন শিশুকে এ টিকা খাওয়ানো হয়।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বাড়ি পেলেন প্রতিবন্ধী রুবিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে একটি পাকা বাড়ি পেলেন মানসিক প্রতিবন্ধী রুবিনা বেগম। ১৭ই অক্টোবর দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের মধ্যমপাড়ায় প্রতিবন্ধী রুবিনা বেগমের হাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বাড়ির চাবি

তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম। এসময় জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা কেউ নিরাশ্রয় থাকবে না। 'আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার'– মুজিববর্ষের এই স্লোগান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রুবিনা বেগমকে এই বাড়ি প্রদান করা হয়।

প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ১৫ই অক্টোবর রাজধানীর মিরপুরস্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে 'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির স্মার্ট সাদাছড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে স্মার্ট সাদাছড়ি পায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি বিশেষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ৬৪ জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে ৯টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে শতভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রীলঙ্কাকে টপকে গেল বাংলাদেশ

আইসিসি'র ওয়ান ডে র‍্যাংকিংয়ে শ্রীলঙ্কাকে টপকে আটে উঠে এসেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। নারী ওয়ান ডে দল ২রা অক্টোবর পর্যন্ত র‍্যাংকিংয়ে নবম স্থানে ছিল। রেটিং পয়েন্ট ছিল ৫৪। সাত রেটিং পয়েন্ট বেশি পেয়ে সালমা খাতুনরা উঠে এসেছেন অষ্টমে। ৪৭ রেটিং পয়েন্টে শ্রীলঙ্কা নেমে গেছে নবম স্থানে। ১৬০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি শীর্ষে রয়েছে ছয়বারের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১২১ পয়েন্ট) এবং ইংল্যান্ড (১১৯)।

৩৭ পদক জয় বাংলাদেশের

প্রথম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পুমসে তায়কোয়ান্দো লাইভ চ্যাম্পিয়নশিপে নয়টি স্বর্ণসহ ৩৭টি পদক জিতেছে স্বাগতিকরা। ৪ঠা অক্টোবর মোহাম্মদপুর ক্লাবে দুই দিনের প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোর্শেদ হোসেন কামাল। প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, স্পেন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়াসহ ৩০ দেশের ১০০টি তায়কোয়ান্দো ক্লাবের ৩৫০ জন খেলোয়াড় অনলাইনে পুমসে ইভেন্টে অংশ নেন। আয়োজক দেশ বাংলাদেশের ৭১ জন খেলোয়াড় এতে অংশ নেয়।

নারী ফুটবলারদের ক্যাম্প শুরু

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বের জন্য নারী ফুটবলারদের ক্যাম্প শুরু হয়েছে ৮ই অক্টোবর। আগামী বছরের ৩-১১ই এপ্রিল অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টের বাছাইয়ে ১৫ জন এবং ১৩-২১শে মার্চ অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টের জন্য ১৮ জন ফুটবলার ডাক পেয়েছেন ক্যাম্পে। নারী ফুটবল দলের কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন বলেন, মেয়েরা এতদিন আমাদের নির্দেশনা বাড়িতে অনুসরণ করেছে। এবার করোনার কারণে সীমিত আকারে তাদের ডাকা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুশীলন করানো হবে। অন্য ফুটবলারদেরও ডাকা হবে।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী মনসুর উল করিম

আফরোজা রুমা

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সাবেক অধ্যাপক মনসুর উল করিম চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৫ই অক্টোবর দুপুর ১২টায় ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মনসুর উল করিমের জন্ম ১৯৫০ সালে রাজবাড়িতে। ১৯৭২ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে চারুকলায় স্নাতক এবং ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শেষে ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন তিনি। ২০১৬ সালে এখান থেকেই অবসর নেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে প্রায় ৪০ বছর অধ্যাপনা করেন তিনি।

১৯৭২ সালে প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী করেন তিনি । ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে 'রেখার নাচন' শীর্ষক তাঁর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর বেশির ভাগ চিত্রকর্মে গ্রামের বেড়ে ওঠার ছাপ, পদ্মাপাড়ের মানুষ, পদ্মার জীবনযাত্রা, ফিরে দেখা, মেঠোপথ– এসব বিষয় বার বার উঠে এসেছে। অবসর গ্রহণের পর মনসুর উল করিম রাজবাড়ি জেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের স্বর্ণ শিমুলতলা গ্রামে ৩ একর জমির ওপর গড়ে তোলেন 'বুনন আর্ট স্পেস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। আর সেখানে তিনি তাঁর শিল্পচর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন। সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গিয়ে শিল্পচর্চা করেন।

সত্তরের দশকের শুরু থেকে দেশের চিত্রশিল্পে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করে। ২০১৩ সালে শিল্পকলা একাডেমি থেকে লাভ করেন সুলতান পদক। এই গুণী শিল্পী আরো লাভ করেছেন অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

রাজবাড়ি জেলার কৃতি সন্তান মনসুর উল করিমের মরদেহ রাজবাড়ি জেলা শহরে কাজীবাধা এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'বুনন আর্ট স্পেস'-এ আনা হয় এবং রাত ৮টায় রাজবাড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে ভবানীপুর পৌর গোরস্তানে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 05, November 2020, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd